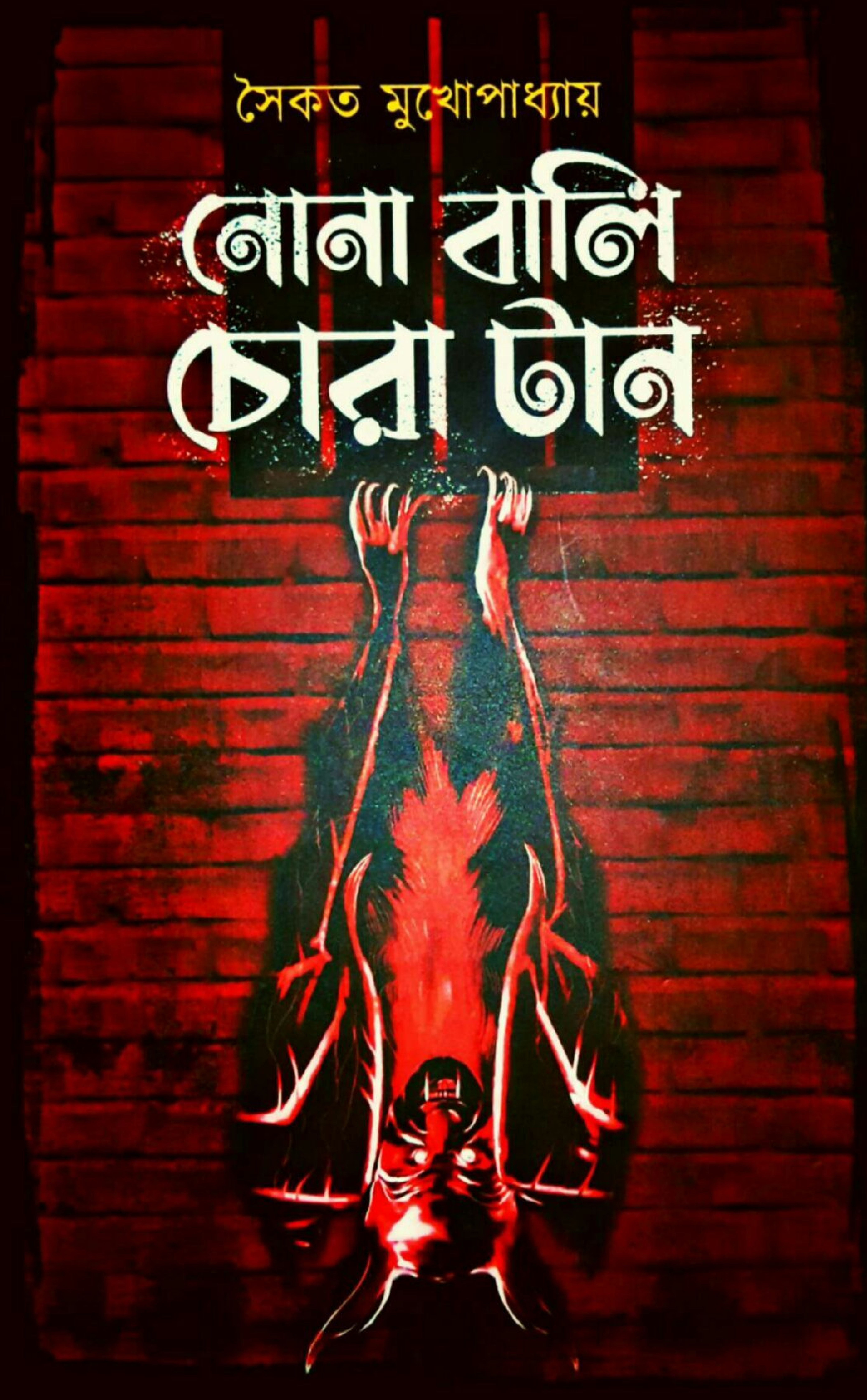
সৈকত মুখোপাধ্যায়

নোনা বালি চোরা টান



এই সংকলনের ছটি বিস্তারিত উপাখ্যানকে ফ্যান্টাসির আশ্চর্য ফসল বলা যায়। দুই মলাটের মধ্যে আপনাদের জন্যে ধরা রইলো এমনই এক মায়াজগত যেখানে একটা বাতিল পাম্পমেশিনের শরীরী সম্মোহনে ধরা দেয় এক নারী অথবা নিহত প্রেমিক বাদুড়ের রূপ ধরে ফিরে আসে। যেখানে একটা ক্যালাইডোস্কোপের ভেতর খুঁজে পাওয়া যায় হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি শিশুকে কিংবা দেড়শো বছর আগে জেলেদের জালে ধরা পড়া মৎস্যকন্যা পরিত্যক্ত রেলগুমটির মেঝেতে শুয়ে শরীর বিক্রি করে। কল্পনার প্রাবল্য আর ভাষার জাদু মিলিয়ে গড়ে উঠেছে বুঁদ হয়ে পড়বার মতন এই ছটি উপাখ্যান।

মূল্য: ২০০.০০

নোনা বালি চোরা টান

সৈকত মুখোপাধ্যায়

অরণ্যমন প্রকাশনী

আলো-স্রোত, কালো-স্রোত

এই দুই স্রোতের মাঝখানে সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সৈকত মুখোপাধ্যায়— কমপক্ষে এক দশক ধরে। ওঁর গল্পে কখনও থাকে আলো-স্রোত, কখনও থাকে কালো-স্রোত, আবার কখনও থাকে দুই স্রোতের বিনুনি। সাহিত্যশিল্পে সৈকতের দক্ষতা প্রশ্নের অতীত। এই বিরল দক্ষতার প্রমাণ তিনি বারবার দিয়েছেন, এবং দিয়ে চলেছেন। কিন্তু ওঁর দক্ষতা এক অবিশ্বাস্য শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যায় যখন তিনি কালো-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন, হয়ে ওঠেন অন্ধকারের সম্রাট, অন্ধকার রং দিয়ে সাজিয়ে তোলেন তাঁর সাহিত্যশিল্প। তখন আমরা পাঠক হিসেবে উপহার পাই অনন্য 'অন্ধকার সাহিত্য' বা 'ডার্ক ফিকশন'।

'ডার্ক ফিকশন' বা 'ডার্ক ফ্যান্টাসি' কোন ধরনের গল্প-উপন্যাসকে বলা যেতে পারে তা নিয়ে পণ্ডিতরা জটিল বিতর্কে নেমে পড়তে পারেন, তবে সহজ কথায় বলা যায়, মানুষের মনের কালো-স্রোত নিয়ে যেসব গল্প-শিল্প গরে ওঠে, যার সঙ্গে মিশে থাকতে পারে হরার কিংবা অলৌকিক এলিমেন্ট, সেই সব গল্পকে আমরা 'ডার্ক ফিকশন' শ্রেণিতে ফেলতে পারি। বাস্তবের ছবি আর 'অদ্ভুত কল্পনা'-র কারুশিল্প মিশে থাকে সেখানে। সেই ঘরানায় লেখা সৈকতের ছ'টি 'ডার্ক ফিকশন' সংকলিত হয়েছে এই 'নোনা বালি চোরা টান' বইটিতে।

বছর দুয়েক আগে একই ধরনের গল্প নিয়ে সৈকতের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল 'ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণ'। সেই বইয়ের গল্পগুলো এমন ছিল যে, একবার পড়ার পর ভোলা যায় না কিছুতেই। 'নোনা বালি চোরা টান' বইয়ের ছ'টি ঠিক তাই। প্রতিটি গল্প পড়ার পর গল্পের চরিত্র আর ঘটনা তীব্রভাবে ঢুকে যায় মর্মস্থলে। এবং সেখানেই তারা বসবাস করতে থাকে।

এইখানে সৈকতের লেখা থেকে কয়েকটি টুকরো তুলে ধরা যাক:

১. 'লোকটার অনেক কিছুই মানুষের সঙ্গে মেলে না। যেমন আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ও লম্বা লিকলিকে একটা জিভ বার করে পুরো মুখটা চেটে নিল। এর আগে কোনো মানুষকে আমি নিজের চোখ, কপাল, কানের ওপর দিয়ে এইভাবে জিভ বুলিয়ে নিতে দেখিনি। তাছাড়া ও যখন একবার পাশের দিকে মুখ ফেরাল, তখন পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ওর এক কানের ফুটোর মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে অন্য কানের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে।' (দুটো নখের দাগ)

২. ' "মানবশিশু" কি বলা যায় তাকে? মানবশিশুর মুখে কি জন্মলগ্নেই অমন ঝকমকে দু-পার্টি দাঁত থাকে? সে কি অমন শয়তানের মতন ত্রিলোকহরির চোখে চোখ রেখে হাসতে পারে? কোনো মানবশিশু কি এমন ফলুইমাছের মতন শরীর বাঁকিয়ে লাফ মেরে উঠে আসতে পারে গভীর চৌবাচ্চার নিচ থেকে ওপরে, শক্ত পারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মন্দিরের মেঝেয়?' (নোনা বালি চোরা টান)

৩. স্নানঘরের জানলাটা দেয়ালের অনেক উঁচুতে বসানো। কিন্তু ইভিলের ইচ্ছে করছিল তাহিতির স্নান দেখে।

একটা গিরগিটি একটু দূরে একটা পাথরের ওপর শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। ইভিল সেটাকে মনের একটা জোরালো ঝটকায় একদম নিজের পায়ের কাছে এনে ফেলল। তারপর গিরগিটির মুণ্ডুটাকে একটা চোখের মণি বানিয়ে দিয়ে বলল, যা। গিরগিটিটা দৌড়তে-দৌড়তে স্নানঘরের দেয়াল বেয়ে খোলা জানালার পাল্লায় গিয়ে বসল। ওঁর চোখ দিয়ে ইভিল প্রাণ ভরে তাহিতির নগ্নতা দেখল।' (ইভিল)

এই নমুনা থেকেই আভাস পাওয়া যায়, সৈকতের কনটেন্ট আর এক্সপ্রেশান কতটা অন্যরকম। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সৈকতের গল্পে বিষয়বস্তু, ভাষা আর রচনাশৈলী তিন বন্ধুর মতো হাত-ধরাধরি করে পথ চলে।

আসুন সেই পথ চলায় সামিল হই আমরাও —পাঠক হিসেবে। আমার বিশ্বাস, এই পথ চলা আমাদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

অনীশ দেব..

৩১-১২-২০২০

সূচিপত্র



দুটো নখের দাগ



।। এক ।।

দাইয়ের নাম পার্বতীয়া।

শুধুই পার্বতীয়া। তার পদবি কেউ জানে না, যেমন জানে না তার বয়স। বয়স তার আশি হতে পারে, নব্বই হতে পারে, একশো হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মাথাভরতি ঝুলঝাড়ুর মতন সাদা চুলের বোঝা। চিবুকে গুনে গুনে চারটি খড়খড়ে লম্বা লোম। বলাই বাহুল্য, মাথার চুল, ভুরু কিংবা চোখের পলকের মতন সেগুলোও দুধসাদা। শরীরের চামড়া বয়সের ঘষটানিতে এমন পাতলা হয়ে গেছে যে, হাতের চেটোর উলটোদিকের নলিগুলোর মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচলের টিপটিপানি খালি চোখেই দেখতে পাওয়া যায়।

পার্বতীয়ামাসি দাবি করে, হরিমিট্টি মৌজার অন্তর্গত হরিমিট্টি, কুসুমডি, নইছইয়া, সুখবাসিয়া ইত্যাদি সাতটা গ্রামের শতকরা নব্বই জন মেয়ে-মরদ তার ওই জরাজীর্ণ দুটো হাতের ওপরে শুয়েই মায়ের কোঁখ থেকে বাইরের পৃথিবীতে এসেছে। পার্বতীয়াই বাঁশের ছিলকা দিয়ে তাদের নাড়ি কেটেছে; হাতকোদালি দিয়ে তাদের ফুল পুঁতে এসেছে পুকুরপাড়ের জমিতে। অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কারণ সদর-টাউন থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এই পাহাড়ি বানজার এলাকায় মেটারনিটি-সেন্টারটার পত্তন হয়েছে সবেমাত্র দু-বছর আগে। তার আগে পর্যন্ত বাড়ির আঁতুড়ঘরেই প্রসব হত, আর সেখানকার অধিশ্বরী ছিল এই পার্বতীয়া।

দারুণ সাজানো-গোছানো আমাদের এই কুসুমডির মেটারনিটি-সেন্টার। সিজারিয়ান সেকশনের বন্দোবস্ত আছে, ইনকিউবেটর আছে। এক্স-রে মেশিন, আল্ট্রা-সোনোগ্রাফি মেশিন সব রয়েছে। রয়েছে বিশাল জেনারেটর সেট। শুধু মহামান্য সরকার-বাহাদুর মেশিন নিয়ে কাজ করার জন্যে যথেষ্ট সংখ্যায় মানুষ দিতে ভুলে গেছেন।

মানুষ বলতে দুজন। আমি – ডক্টর বেদব্রত শর্মা। আর একজন ক্লার্ক, আসাদুর রহমান। না আছেন দ্বিতীয় কোনো ডাক্তার, না নার্স। এমনকি একজন শিক্ষিতা দাই, যাদের বলা হয় মিডওয়াইফ, তা অবধি নেই। এদিকে পঞ্চায়েতের মোড়ল কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছে – তার সরকারের বানিয়ে দেওয়া নতুন মেটারনিটি সেন্টার ছেড়ে যে আবাগির বেটি বাড়িতে বাচ্চা বিয়োবে, তার পুরো ফ্যামিলির ডোল বন্ধ করে দেওয়া হবে। কাজেই প্রতিদিন গড়ে তিনটি মেয়ে লেবার পেন নিয়ে মেটারনিটি সেন্টারের বিছানায় শুয়ে কাতরায়।

হয় পাগল হয়ে যেতাম, নয় সুইসাইড করতে হত, যদি না পার্বতীয়ামাসি থাকত।

এখন মেটারনিটি সেন্টারের লেবার-রুমে এই ডাক্তার শর্মার হাতেই অফিশিয়ালি প্রতিটি ডেলিভারি হয়, কিন্তু আসলে মাসি-ই যা করার করে। আমি শুধু পাশে দাঁড়িয়ে ওর কেরামতি দেখি আর তারিফ করি।

এমনিতে এদিকের চাষিঘরের মেয়ে-বউদের বেড়ালের মতন সহজে প্রসব হয়। তবু কখনও হয়তো কোনো মেয়ের জল ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে, অথচ বাচ্চার মাথা নীচের দিকে নামছে না। আমি অবাক হয়ে দেখি, পার্বতীয়ামাসি তখন তার নব্বই কিংবা একশো বছরের পুরোনো হাতে কী অদ্ভুত কায়দায় স্রেফ বাইরে থেকে পেটের ওপর দলাই-মলাই করতে করতে বাচ্চার মাথাকে বার্থ ক্যানালের মধ্যে নামিয়ে আনে।

পার্বতীয়ামাসিকে আমি হেলথ-সেন্টারের বাজেট থেকেই মাসে মাসে বেশ ভালো পরিমাণ একটা টাকা বার করে দিই। এইটকু ওর প্রাপ্য।

মেটারনিটি সেন্টার হওয়ার পর থেকে মাসি তার 'প্রাইভেট প্র্যাকটিশ' বন্ধ করে দিয়েছে। তার একটা কারণ, পঞ্চায়েতের মোড়লকে সেও ভয় পায়। আর দ্বিতীয় কারণ, বুড়ো বয়সে যদি একজায়গায় বসে থেকে কাজ পাওয়া যায়, তাহলে কে চায় দৌড়োদৌড়ি করতে?

এইভাবেই পার্বতীয়ামাসিকে ধরে কুসুমডির মেটারনিটি-সেন্টারের পানিশমেন্ট-পোস্টিং পার করে দিচ্ছিলাম। দুটো বছর কেটেই গিয়েছিল। আর একটা বছর ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দিতে পারলেই রায়পুর কিংবা বিলাসপুরের কোনো বড়ো হাসপাতালে গিয়ে পসার জমিয়ে বসতে পারতাম। কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ একদিন সন্ধের মুখে বাইক-বাহিনী নিয়ে হরিমিট্টি পঞ্চায়েতের মোড়ল জনকরাম সিং হাজির। আমার বাংলোটা মেটারনিটি-সেন্টারের ঠিক পেছনে। সেই বাংলোর বারান্দায় বসে বিকেলবেলায় বাসি খবরের কাগজ পড়ছিলাম। চরাচর কাঁপিয়ে দিয়ে ঠিক তখনই আমার শখের গাঁদাফুলের বেডের ওপরে এসে দাঁড়ালো জনকরামের চ্যালা বাবলু মান্ডির সাইলেন্সারবিহীন রোডরানার। পিনিয়ন থেকে ধুতির কোঁচা-টোচা সামলে নেমে এল জনকরাম সিং। বলল, রাম রাম ডগদরসাব!

শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা অত্যন্ত খতরনাক। মাফিয়াই বলা চলে। ভারতের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে কটা কালা ধান্দা চলতে পারে সবকটাতেই লোকটার হিস্যা আছে। বেআইনি স্টোন-ক্রাশার, জঙ্গলের কাঠ চুরি, এমনকি মেয়ে পাচার অবধি। বেশ কটা খুন করেছে। প্রতিপক্ষের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া তো ডালভাত। আমি লোকটাকে ভয় পাই। হ্যাঁ, সরকারি ডাক্তার হলেও ভয় পাই কারণ, এই হরিমিট্টি মৌজায় সরকারের নাম জনকরাম সিং। তাই সবিনয়ে নিজেই কুর্সি এগিয়ে দিলাম। ততোধিক সবিনয়ে বললাম, রাম রাম সিংজি। ফরমাইয়ে, ক্যা সেবা-মে লাগ সকতে হ্যায়।

লোকটার আমসির মতন শুকনো ছিবড়ে চেহারা। তোবড়ানো গাল, সাড়ে পাঁচফুট হাইট। মাথার চুলে মোটা করে কলপ মাখিয়ে পেছনে টেনে আঁচড়ানো। সবথেকে আশ্চর্য লোকটার চোখদুটো। অত খুদে চোখে অতটা হিংস্রতা আর কোনো মানুষের মুখে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

লোকটা নিজের পঞ্চায়েত এরিয়ার ভেতরে সবাইকেই তুমি কিংবা তুই বলে সম্বোধন করে। বেশ টিপ করে আমার ডালিয়ার টবের ওপর গুটখার লাল থুতু ফেলে, হাতের উলটোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বলল, আমার বউয়ের পেটে বাচ্চা এসেছে। কাল ওকে নিয়ে আসব। তোমার এখানে পেটের বাচ্চার তসবির খিঁচবার মেশিন আছে তো?

বিপদটা আঁচ করতে পেরে শুকনোমুখে ঘাড় হেলালাম।

বহোত খুব। একটু মেহেরবানি করে বলে দিয়ো, বিবির পেটে ছেলে আছে, না মেয়ে। এই বলে জনকরাম আবার বাইকের পিনিয়নে চড়ে বসল। আমি কোনোরকমে বলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সিংজি। আপনি আইনের রক্ষক। আপনি তো ভালো করেই জানেন ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বেআইনি। আর তার দরকারটাই বা কী? ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক...।

আমার কথার মাঝখানেই জনকরাম বাঁ-হাতটা একটু ওপরদিকে তুলে চেঁচিয়ে উঠল- খামোশ! ওসব লেকচারবাজি রায়পুরের ভদ্রলোকদের কাছে গিয়ে মারিও ডাক্তার। আমার কাছে অন্তত দশটা মেয়ে কমপ্লেন করেছে তুমি এগজামিন করার নাম করে নিজের চেম্বারে ঢুকিয়ে ওদের বেইজ্জত করেছ। বেশি নখড়া করলে সেই দশজন মেয়েকে দিয়ে তোমার নামে আজই থানায় এফ আই আর করাব। চালা বাবলু।

বাবলু কিক-স্টার্ট করার আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, সিংজির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমার বয়স মাত্রই তিরিশ বছর। বাবা ঘটিবাটি বন্ধক রেখে ডাক্তারি পড়িয়েছেন। এখনও বোনের বিয়ে দেওয়া বাকি, নিজেরও একটি লাভার রয়েছে। কেরিয়ারের এই ঊষালগ্নে যদি জনকরামের পার্টির দশটি সম্মাননীয়া সদস্যা আমার নামে শ্লীলতাহানীর কেস আনেন তাহলে বাকি জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভারতের অসংখ্য মৃত কন্যাভ্রূণের সংখ্যা একটি যদি বাড়ে তো বাড়ুক। আমার বয়েই গেল।

।। দুই ।।

জনকরাম অ্যান্ড কোম্পানি ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হুঁশ ফিরল পেছনদিক থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দে। বয়সের চাপে পার্বতীয়ামাসির টিয়ার-গ্ল্যান্ডস শুকিয়ে গিয়েছে। কাঁদলেও চোখ থেকে জল পড়ে না। শুকনো চোখেই ও বিন-বিন করে কেঁদে চলেছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন পার্বতীয়ামাসি? আমার দুঃখে?

কেন? মুখপোড়া ভগবান কি পৃথিবীর সমস্ত মেয়ের কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে যে, তোমার মতন জোয়ান মরদের দুঃখে কাঁদব? কাঁদছি মহুয়াবিটির নসিবের কথা ভেবে।

মহুয়া আবার কে?

ওই তো, রেন্ডি-কা-আওলাদ জনকরামের বহু। মহুয়া সিং। আদতে সুখবাসিয়ার মেয়ে। উমর মাত্র উনিশ কী বিশ। রায়পুরের কলেজে পড়াশোনা করছিল। লক্ষ্মীমাইয়ার মতন সুরত। জনকরাম ওকে গত বৈশাখে ঘর থেকে গুন্ডা দিয়ে তুলে এনে শাদি করেছে। তিননম্বর শাদি।

বলো কী মাসি! লোকটার দুটো বউ আছে? তারপরেও আর একটা? আগের দুটো বউ ছেলে দিতে পারেনি বোধহয়। এইসব পয়সাওয়ালা বদমাশগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা উত্তরাধিকারীর মুখ দেখছে ততক্ষণ অবধি...।

না না। —মোটা মোটা রুপোর খাড়ুপরা হাত নেড়ে পার্বতীয়া জানাল আমার আন্দাজ ভুল। —আগের দুটো বউয়ের বেটা আছে, বিটিও রয়েছে। সবই তো আমার হাতে ডেলবারি।

তবে?

পার্বতীয়ামাসি নাকি স্বাধীনতার আগে বিলাসপুরের রেল-কলোনিতে খাঁটি মেমসাহেবদের দাই হিসেবে কাজ করেছে। কথার মধ্যে এক দুটো ইংরিজি শব্দ বেশ গুঁজে দিতে পারে, বিশেষত সেসব কথা যদি গুরুগম্ভীর ধরনের হয়। এখনই যেমন আমার কথার উত্তরে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দা কেস ইজ ভেরি স্যাড, ভেরি ডেনজারাস।

আমি একটা মোড়া টেনে নিয়ে ওর পাশে বসে বললাম, স্যাড কেন?

জনকরামের ছেলেমেয়েগুলো সব অসুস্থ আর অন্ধ হয়ে জন্মায়। দুটো বউয়ের ওরকম কয়েকটা বাচ্চা জন্মের পরেই মারা গেছে। এখন যে-দুটো বেঁচে আছে সে দুটো অন্ধ তো বটেই, তা ছাড়া যত বড়ো হচ্ছে ততই ন্যালাখ্যাপা হয়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ মুখ দিয়ে নাল পড়ে। এ দুটোও বেশিদিন বাঁচবে না।

আমার চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে গেল। আড়চোখে পার্বতীয়ার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম ও দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। মুখের অজস্র বলিরেখার আড়াল থেকে ওর মনের ভাব বোঝা অসাধ্য।

পরের দিন খুব সকালেই সিং-দম্পতি আমাদের সেন্টারে পদধূলি দিল। দেখলাম জনকরাম নিজেই একটা ট্রেকার চালিয়ে বউকে নিয়ে এসেছে। নিজেই মহুয়ার হাত ধরে সেন্টারের বারান্দা অবধি নিয়ে এল। ওকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি আর পার্বতীয়ামাসি মহুয়াকে নিয়ে ঢুকলাম আল্ট্রা-সোনোগ্রাফি করার ঘরে।

মহুয়া মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী। রোগা লম্বা গড়ন। ডিমের ছাঁদের মুখ। বড়ো বড়ো দুটো চোখে খুব ঘন কালো পলক। পাকা ভুট্টার দানার মতন গায়ের রং। আমার নিজেরই চিন্তা হচ্ছিল, যদি ইউ. এস. জি.-তে দেখা যায় পেটে মেয়ে আছে তাহলে তো জনকরাম অবধারিতভাবে বলবে অ্যাবর্ট করার কথা। তিনমাসের ফিটাস, তাকে কিউরেট করার ধকল সহ্য করতে পারবে এই রোগা বাচ্চা মেয়েটা?

মহুয়া কিন্তু দেখলাম বেপরোয়া। অন্তত মুখের ভাবে ভয়ডর কিছুই টের পেলাম না। ভেবেছিলাম ওরকম একটা হিংস্র লোকের বউ, সারাক্ষণ হয়তো ভয়ে সিঁটিয়ে থাকবে। ভেবেছিলাম, ভয় না হোক, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে শোকের একটা ছায়া নিশ্চয়ই জড়িয়ে থাকবে মহুয়ার চোখে। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, ভয় কিংবা শোক কিছুই নয়। একটা দাঁতে দাঁত চাপা জেদ, একটা চেপে রাখা রাগ যেন হলকার মতন ওর পুরো শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিল। তা ছাড়া কথায়বার্তায় ছিল শিক্ষার ছাপ।

অবশ্য একটু পরে মনিটরের ওপর ফিটাসের ছবি দেখে আমার মুখ দিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। মহুয়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। চোখে প্রশ্ন।

আমি বললাম, খুশ রহো বহেন। বেটা হোগা তুমহারা।

আমি মহুয়ার তলপেটের ওপর প্রোব-টা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনিটরে ফিটাসের ছবি দেখছিলাম। মহুয়া হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, বোন বললেন আপনি আমাকে! বোন বললেন তো? তাহলে বোনের একটা আবদার রাখুন। বাইরে যে পিশাচটা অপেক্ষা করছে তাকে বলুন আমার পেটে মেয়ে এসেছে। মিথ্যে করেই বলুন। তারপর সাফ করে দিন আমার পেটের এই নোংরাটাকে।

আমি বজ্রাহতের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম পার্বতীয়ামাসির দিকে। দেখলাম সে একমনে মহুয়ার কথা শুনছে। আবার ফিরে তাকালাম মহুয়ার মুখের দিকে। বড় বড়

চোখদুটোতে অসহ্য আর্তি নিয়ে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে বললাম, কেন বোন? তুমি চাওনা, তোমার একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হোক? সে মা মা বলে তোমার আঁচল ধরে তোমার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াবে। তুমি তাকে অ আ ক খ শেখাবে। তাকে নিয়ে মেলায় ঘুরতে...।

চুপ করুন... চুপ করুন... চুপ করুউউন! দু-হাতে নিজের কানদুটো চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল মহুয়া। ভাগ্যিস ঘরটার দরজা জানলা সব চেপে বন্ধ করা ছিল, নাহলে সেই চিৎকার শুনে জনকরাম নির্ঘাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ত।

মহুয়া এবার গলা নামিয়ে বলল, এত অবুঝ লোক আপনি ডাক্তারবাবু? আপনি জানেন না, আমার দুই সতীনের বাচ্চাগুলো অন্ধ হয়ে জন্মায়? বুকে কফ জমে দমবন্ধ হয়ে মারা যায়? পার্বতীয়া-নানী বলেনি আপনাকে সে কথা?

আমি মাথা হেলালাম। বললাম, বলেছে।

তাহলে? আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন জনকরামের যৌন রোগ আছে? আমাদের, মানে ওর বউদের শরীরেও সেই বিমারির বিষ ঢুকে গেছে আর তাই আমাদের পেটের বাচ্চাগুলোও সেই বিষ শরীরে নিয়েই জন্মায় আর মরে যায়?

কথা বলতে বলতে কান্নায় মহুয়ার গলা বসে যাচ্ছিল। সেইভাবেই ও বলে যাচ্ছিল— এই যে আমার পেটের মধ্যে যে বাচ্চাটা বেড়ে উঠছে, এটাও তো ওই রোগ নিয়েই জন্মাবে। অন্ধ হবে, অসহ্য কষ্ট পাবে। তারপর মরবে। তার চেয়ে এখনই মেরে ফেলুন না ডাক্তারবাবু!

আমি বললাম, পারব না বোন। আমি ডাক্তার। বিনা কারণে ভ্রূণহত্যা করতে পারি না।

মহুয়া অবাক হয়ে বলল, বিনা কারণে! আমি যা বললাম, সেটা আপনার কাছে যথেষ্ট কারণ বলে মনে হচ্ছে না ডাক্তারসাব? অথচ এই আপনিই তো ইউ.এস.জি-তে মেয়ে ভ্রূণের ছবি পেলে আজ কিংবা কালকের মধ্যেই সেটাকে মেরে ফেলতেন। সত্যি বলুন তো, ফেলতেন না?

মনে মনে ভাবলাম, কী যে বলে বোকা মেয়েটা! এ হল সরপঞ্চ জনকরামের ছেলের ভ্রূণ – তাকে রক্ষা করার দায় তো আমার,

পার্বতীয়ার, আমাদের সবার। পুরোহিতের মতন পবিত্র গলায় বললাম, শোনো বোন, আমি চেষ্টা করব যাতে তোমার বাচ্চার শরীরে সিফিলিসের জার্ম না পৌঁছোয়। দরকার হলে স্পেশালি নার্স, অ্যানাসথেসিস্ট এনাদের এখানে আনিয়ে তোমার সিজারিয়ান সেকশন করব। বার্থ ক্যানালটাকে এড়িয়ে যেতে পারলে হয়তো বাচ্চাটা... যাগগে, অতসব তুমি বুঝবে না। এইটুকু জেনে রাখো, এমনকি তোমার বাচ্চা যদি সিফিলিসের জার্ম শরীরে নিয়েও জন্মায়, আমরা মডার্ন মেডিসিন দিয়ে তাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করতে পারি।

মহুয়ার চোখ দিয়ে আগুন ছুটল। সে বলল, ছিঃ ডাক্তারসাব, ছিঃ। আপনারা পুরুষমানুষেরা সব একরকম। শুধু শরীর চেনেন, আর পয়সা। মন চেনেন না। যদি চিনতেন তাহলে বুঝতে পারতেন, একটা পাপের বীজ নিজের শরীরের ভেতরে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে কেমন লাগে। কী জানি কোন বেশ্যামান্ডির মেয়ের যোনিবিষ আমার এই শরীরের ভেতরে ফুলে ফেঁপে উঠছে। ভাবলেই আমার উলটি আসে, সাচ বলছি ডাক্তারসাব। ডাক্তারসাব! মেহেরবানি করুন ডাক্তারসাব!

আমার পাথরের মতন মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল মহুয়া। তারপর পাগলের মতন বিছানা থেকে লাফ মেরে উঠে পার্বতীয়াকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি কিছু করো, নানি। তুমি তো নিজে একজন আওরত। তুমি তো আমার দুঃখ বুঝবে। একটা শেকড়, একটা বিষবড়ি। যা হোক একটা কিছু দাও নানি, যাতে এই পাপটাকে খালাস করতে পারি।

পার্বতীয়া বলল, সবুর কর বেটি। ভগবান আছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তখনই হঠাৎ রেডিয়োলজি-রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল জনকরাম। মেঝের ওপরে বসে থাকা অশ্রুমতী মহুয়ার দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে কড়া গলায় প্রশ্ন করল – কী ব্যাপার? ও কাঁদছে কেন?

আমি তড়িঘড়ি বলে উঠলাম – আনন্দে সরপঞ্চজি, আনন্দে। আপনার ঘরে বেটা আসছে।

জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান! দুহাত আকাশের দিকে তুলে জিকির দিয়ে উঠল জনকরাম। তারপর ভারি মায়ামাখা গলায় মহুয়াকে বলল, চল, বউ। ঘরে চল। এখন কয়েকটা মাস তোকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

।। তিন ।।

আমাদের মেটারনিটি-সেন্টারের নতুন বিল্ডিং-এর পেছনদিকটায় একটা বহু পুরোনো একতলা বাড়ি রয়েছে। ওটাই ছিল আদি বাড়ি। গভর্নমেন্টের অনুদানে রাস্তার গায়ে নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার পর পুরোনো বাড়িটা ভূতুড়ে হয়ে পড়ে রয়েছে। দু-বছরেই বাড়িটার গায়ের পলেস্তারা খসে পড়েছে। বটচারা গজিয়ে উঠেছে কার্নিশের ফাঁকে।

কিছুদিন হল ওই বাড়িটার ভেতরে এক বাদুড়-পরিবার বাসা বেঁধেছে।

আমার কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে দেখতে পাই, সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে এক-এক করে ছটা বাদুড় বেরিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ আকাশে চক্কর মারে। তারপর কোন দূরের গ্রামের ফলবাগানের দিকে চলে যায় কে জানে। কত ভোরে ওরা আবার ফিরে আসে তাও জানি না; আমি অত সকালে কোনোদিনই উঠতে পারি না। তবে দিনের বেলায় মাঝে-মাঝেই ওদিক থেকে প্রবল কিচমিচ শব্দ ভেসে আসে।

বাদুড় নিয়ে এত কথা বলার কারণ একটাই। আমি প্রাণীগুলোর জন্যে চিন্তিত।

জনকরাম আর তার দলবলের মধ্যে একটা জান্তব হিংস্রতা রয়েছে। সেটা ফুটে বেরোয় ওদের শিকার অভিযানগুলোর মধ্যে দিয়ে। ওরা যখন মানুষ শিকার করে তখন তাকে বলে 'খাল্লাস'। যখন অন্য কোনো পশুপাখি শিকার করে, তাকে বলে 'পটশট'।

আমি দু-ধরনের শিকারের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত খুঁজে পাই না।

নিছক খেলার ছলে ওরা মানুষ খুন করে। মেয়েমানুষ হলে অবধারিতভাবে তাকে খুন করার আগে রেপ করে। আর পুরুষমানুষ হলে ফিনিশ করার আগে তার চোখ উপড়ে নেয়, তাকে জিপের পেছনে বেঁধে পাহাড়ি রাস্তা ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যায়।

একইভাবে ওরা পশুপাখিও মারে।

ছোটো ছোটো বগেরিপাখিগুলোকে ফাঁদ পেতে ধরে। তারপর জ্যান্ত

পাখিগুলোর চোখের মধ্যে দিয়ে কাশপাতার সুতো গলিয়ে মালা গাঁথে। সেই মালা গলায় পরে হইহই করতে করতে হেঁটে যায় দারুখানার দিকে।

শজারু মারে অভিনব উপায়ে। একটা কলাগাছের মোটা আর নরম কাণ্ড টুকরো টুকরো করে কেটে শজারু যাতায়াতের রাস্তার ধারে গুঁড়ি মেরে বসে থাকে। ওদের সামনে পড়ে গিয়ে শজারুটা যেই কাঁটা ফুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, সঙ্গে-সঙ্গে ওই ভারী কলাগাছের কাণ্ড তার পিঠের কাঁটার ওপরে ছুড়ে গেঁথে দেয়। শজারুটার যখন আর নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকে না, তখন বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে তাকে শেষ করে দেয়।

একবার ওদের গোসাপ মারতে দেখে আমি সারাদিন কিছু খেতে পারিনি, এত গা গুলিয়েছিল। অত বড়ো জন্তুটাকে ওরা চিৎ করে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধেছিল। তারপর চোয়াল থেকে লেজ অবধি ধারালো ছুরির টানে জ্যান্ত প্রাণীটার চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। গোসাপের চামড়ার নাকি অনেক দাম, তাই গলা কেটে বা খুঁচিয়ে তাকে মারে না। জন্তুটার কাতর হিসহিসানি এখনও কানে বাজে।

কাক-শকুনের মাংস ছাড়া সব খায় ওরা – কচ্ছপ, সাপ, বক, পানকৌড়ি। এই হরিমিট্টি মৌজায় জনকরাম আর তার দলবলের খিদের হাত থেকে কারুর রেহাই নেই। হ্যাঁ, বাদুড়ও খায়। তবে ভরসার কথা একটাই। বাদুড়গুলো এবারে খুব ভালো জায়গায় আস্তানা গেঁড়েছে। গাছের ডালে ঝুলে থাকলে প্রথমদিনেই সাবাড় হয়ে যেত। পুরোনো ঘরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে বলে এখনও ওদের চোখ এড়িয়ে থাকতে পারছে। তবে কতদিন থাকতে পারবে জানি না।

মহুয়ার কথাও প্রায়ই ভাবি। মহুয়া ভালো নেই, কিন্তু ওর পেটের বাচ্চা ভালো আছে।

ভাবি, মানুষ কী অসহায় জীব! তার বুদ্ধি আর চেতনা গত কুড়িহাজার বছরে রকেটের স্পিডে ওপরে উঠে গেছে। দুনিয়ার আর কোনো প্রাণী কোনোদিনই তার নাগাল পাবে না। অথচ সেই চেতনাকে বয়ে নিয়ে চলেছে যে খাঁচাটা, এই যে শরীর, সেটার তেমন কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি।

যেন একটা আদ্যিকালের মোবাইল ফোনে ভরে দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক সিমকার্ড।

সফটওয়্যারের পরিবর্তন হয়েছে, হার্ডওয়্যার একই রয়ে গেছে।

সেইজন্যেই ওই মহুয়া নামে মেয়েটার মন চায় অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি। অথচ তার শরীরের আদিম সিস্টেম পেটের বাচ্চাকে প্রাণপণে আগলে রাখে, পুষ্টি জোগায়, বড়ো করে তোলে।

শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে কোনো নারীই পারে না নিজের পেটের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে। মহুয়াও পারল না।

পার্বতীয়ামাসির কাছে শুনতাম, মহুয়া নাকি গৃহবন্দি হয়ে রয়েছে। তার মনের কথা বুঝে ফেলতে জনকরামের মতন ধূর্তলোকের বেশিদিন লাগেনি। একদিন এমারজেন্সি কল পেয়ে জনকরামের বাড়ি গিয়ে বুঝতে পারলাম কথাটা মিথ্যে নয়।

মহুয়া কুঁয়োতলার শ্যাওলায় পা পিছলে পড়ে গেছে— এই মর্মে কল এসেছিল। জনকরামের বাড়ির অন্দরমহলের একটা ঘরের মধ্যে মহুয়া শুয়ে ছিল। ওকে পরীক্ষা করে বুঝলাম, বিপদ হতে পারত, কিন্তু হয়নি। ওই যে বলছিলাম, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা নিখুঁত হার্ডওয়্যারের কথা— জরায়ুর ভেতরের জলের-বিছানা পড়ে যাওয়ার ধাক্কা মহুয়ার ভ্রূণের শরীরে পৌঁছোতে দেয়নি।

নজরদারির গাফিলতির জন্যে জনকরাম তার বড়োবউ আর মেজোবউকে সবার সামনেই বেদম গালাগাল করল, তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ওসব কুয়োতলার শ্যাওলা-ট্যাওলা একেবারেই ঢপবাজি। কলেজে পড়া হারামি মেয়েছেলেটা পেটের ছেলেকে নষ্ট করার জন্যে ইচ্ছে করে আছাড় খেয়েছিল।

এই কথা বলার সময় জনকরামের চোখে আমি খুনের ছায়া দেখেছিলাম। সম্ভব হলে ও মহুয়াকে খুনই করত। কিন্তু মা-কে মারলে পেটের বাচ্চাটাও মারা যাবে বলে সেটা করতে পারছে না। তবে জনকরাম যে ওকে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে বেরোতে দিচ্ছে না, সে-কথা ঠিক।

মহুয়া বাড়ি থেকে বেরোতে পারত শুধু আমাদের মেটারনিটি-সেন্টারে আসার জন্যে। রেগুলার আসতে হত ওকে, মাসে অন্তত দু-বার। আসলে সিফিলিসের জীবানুকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেও আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। এ বড়ো খতরনাক চিজ। কখন যে নতুন আক্রোশে আক্রমণ করবে বলা যায় না। তাই আমিই জনকরামকে বলেছিলাম রেগুলার চেক-আপের কথা। জনকরাম আপত্তি করেনি।

পনেরো দিন অন্তর একবার করে হয় জনকরাম নিজে, না হলে ওর বাড়ির অন্য কোনো বিশ্বাসী লোক মহুয়াকে আমার কাছে চেক-আপের জন্যে নিয়ে আসত।

মহুয়া সেই প্রথমদিনের পর থেকে আমার সঙ্গে আর একটাও কথা বলেনি। ও আসত। গম্ভীর মুখে সাদা চাদর চাপা নিয়ে বেডের ওপর শুয়ে পড়ত। আমার গ্লাভস পরা হাত ওর উরুসন্ধির দিকে এগোলেই ওর শরীর কাঠ হয়ে যেত, মুখের থেকে সরে যেত সমস্ত রক্ত।

প্রথম-প্রথম আমি ওকে বোঝাতাম, মহুয়া, আমি একজন ডাক্তার। আমাকে পুরুষমানুষ বলে ভেবো না। আমার পাশে দাঁড়িয়ে পার্বতীয়ামাসিও একই কথা বোঝাত। কিন্তু কোনোই ফল হত না।

কিছুদিন পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, মহুয়ার সংকোচটা আমি পুরুষমানুষ বলে নয়, আমি জানোয়ার বলে। ও আমাকে একটা জানোয়ারের বেশি কিছু ভাবে না। কেনই বা ভাববে? যে-ডাক্তার ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে রাজি হয়, যে-ডাক্তার সিফিলিসের রিস্ক জেনেও শুধু মেল-বেবি বলে একটা ভ্রূণকে বাঁচিয়ে রাখে, সে কি মানুষ? আমি মহুয়াকে কোনো দোষ দিতে পারতাম না।

তা ছাড়া যে-কথা মহুয়ার জানার কথা নয়, কারুরই জানার কথা নয়, সেটাও বোধহয় ও কোনো সিক্সথ-সেন্স দিয়ে টের পেয়েছিল। কথাটা হল, ওর পেটের ছেলে এই পৃথিবীর আলো দেখলেও, ও নিজে বেশিদিন বাঁচবে না। উনিশ বছরের মেয়েটার শরীর মা হবার উপযুক্তই নয়। এমনিতেই রক্ত কম, তার ওপরে সিফিলিসের জীবাণু নতুন রক্ত তৈরি করার রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে।

মহুয়া সব কিছু জানে। ওর মধ্যে একটা হতাশা আর ক্লান্তি দেখতে পেতাম। ও বুঝতে পারত, ওর জন্যে আমি আর জনকরাম কোনো লড়াই বাকি রাখিনি। কিন্তু গত চেক-আপের দিনে ওর চোখেমুখে একটা পাগল-পাগল ভাব, একটা ছটফটানি দেখতে পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, ও যেন কী একটা করার কথা ভাবছে। প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে হঠাৎ একবার ওর মুখের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম ওর ঠোঁটের কোণে ভারি মিষ্টি একটুকরো হাসি। চোখের দৃষ্টি কোন সুদূরে হারিয়ে গেছে।

কীসের স্বপ্ন দেখছিল মহুয়া?

মহুয়া হারিয়ে গেছে। না, না। হারিয়ে যায়নি... মহুয়া পালিয়ে গেছে। ধুত, কী যা তা বলছি। আসলে মহুয়া প্রথমে হারিয়েই গিয়েছিল। তারপরে বোঝা গিয়েছে মহুয়া পালিয়ে গেছে।

সবচেয়ে সর্বনেশে ব্যাপার, মহুয়া হারিয়ে গেছে কিংবা পালিয়ে গেছে আমারই হেফাজত থেকে... এই মেটারনিটি সেন্টার থেকে।

বলেছিলাম না, মহুয়া বাড়ি থেকে বেরোতে পায় একমাত্র এইখানে আসার জন্যে। আজ বিকেলেও সেইরকমই চেক-আপের জন্যে এসেছিল। আজকে মহুয়া এসেছিল একজন কাজের মেয়ের সঙ্গে। জনকরাম নাকি আগের দিনই বাইরে কোথায় ইলেকশনের প্রচারে বেরিয়েছে, তাই আসতে পারেনি।

আমার চেক-আপের কাজ সারা হয়ে গিয়েছিল। বাইরে নিজের চেম্বারে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছিলাম। পার্বতীয়ামাসি রেডিয়োলজি-রুমের ভেতরে মহুয়ার পোশাক-আশাক ঠিকঠাক করে দিচ্ছিল। প্রত্যেকবারই তাই করে। মহুয়ার পোশাক-আশাক ঠিকঠাক করে দিয়ে, মুখের ঘাম মুছে দিয়ে, কপালের খসে পড়া বিন্দি স্বস্থানে বসিয়ে, ওকে ধরে ধরে বাইরে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসে। যাবার সময় আমার হাত থেকে নতুন প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে মহুয়ার সঙ্গে যে থাকে তার হাতে দিয়ে দেয়। কিন্তু এবার প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যাওয়ার পরেও পার্বতীয়ামাসি কিংবা মহুয়া কেউই বেরোল না। যখন একটু একটু অস্থির হচ্ছি, তখনই মহুয়ার সেই কাজের মেয়েটা চেম্বারের দরজায় ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে ডাকল – ডাক্তারসাব!

কেয়া হুয়া? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ছোটি বহুরানি আভি তক নিকাল নেহি বা।

তাই তো। চলো দেখি। বলে আমি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখি পার্বতীয়ামাসি একাই বেডের চাদর টানটান করে পাতছে। ঘরে আর কেউ নেই। মহুয়ার কথা জিজ্ঞেস করায় বলল, ও তো অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম, সে কী! আমার সামনে দিয়েই গিয়েছে? কই, চোখে পড়ল না তো! তা ছাড়া এই মেয়েটাও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ও-ও তো কাউকে দেখেনি বলছে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, পার্বতীয়ামাসি সত্যি কথা বলছে না। দেখতে পাচ্ছিলাম, অ্যাটাচড বাথরুমের পেছনের দরজাটা, যেটা সারাক্ষণ বন্ধই থাকে, সেটার সামনে জড়ো করে রাখা ভাঙা হুইল-চেয়ার, স্ট্রেচার, এইসবের স্তূপটা কেউ সরিয়ে রেখেছে। তার মানে দরজাটা একটু আগে খোলা হয়েছিল।

সবে ভাবছি পার্বতীয়ামাসিকে চেপে ধরে জেরা করব, কিন্তু তার আগেই খান তিনেক ট্রেকার বিকট শব্দে ব্রেক কষে সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সরপঞ্চ জনকরাম সিং-এর নামে জয়ধ্বনি করতে করতে গাড়িগুলো থেকে লাফিয়ে নামল প্রায় তিরিশজন লোক। সবার সামনে জনকরাম নিজে। তার গলায় গাঁদা ফুলের মালা, পরনে কুসুমফুলের হলুদ রঙে চোবানো ধুতি, মাথায় নতুন লাল-গামছার পাগড়ি। তার সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে টাঙি, তিরধনুক, গাদাবন্দুক ইত্যাদি। প্রত্যেকেরই পা তাড়ির নেশায় টলমল করছে। বুঝলাম প্রচার অভিযান সাকসেসফুল হয়েছে, এসব তারই বহিঃপ্রকাশ।

চ্যালাদের বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে মেটারনিটি-সেন্টারের বারান্দায় উঠে এল জনকরাম। আমাকে দেখে লাজুক-মুখে বলল, আমার নোকরানিকে বাইরের রাস্তায় দেখতে পেয়ে বুঝলাম, মহুয়া এখনও এখানেই আছে। তা, তোমার কাজ কি হয়ে গেছে ডাক্তার? তাহলে ওকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাই।

আমি আমতা আমতা করে জনকরামকে মহুয়ার হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। রাগ নয়, উদ্‌বেগ নয়। সব শোনার পর জনকরামের মুখে একটা অদ্ভুত আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। অনেকটা একটা বাচ্চার হাতে নতুন খেলনা তুলে দিলে সে যেরকম হাসে, সেইরকম। আপনমনে বলল, বাঃ, অনেকদিন শিকার-খেলা হয় না। আজ হবে। তারপর সরু গলায় চিৎকার ছাড়ল —এই বাবলু, সনাতন, খুবলাল, ড্যানিয়েল! আরে এই বিন্ধেশ্বর, ঘুনিয়া, পরদেশি, লটকান! আরে শুন শুন ভাই, আজ পটশট হোগা, পটশট। আভি হোগা, ইঁয়াহা হোগা, ইসি ওয়ক্ত হোগা ভাই। যাও যাও, খুদ খুদ-কা পজিশন লে লো।

ওর চ্যালারা চারিদিকের শানবাঁধানো চাতাল আর বৃক্ষহীন পরিবেশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল —পজিশন! কাঁহা পজিশন লু মালিক?

রুখো, আভি বাতাতা হুঁ।

আমাকে একটা ধাক্কা মেরে সামনে থেকে সরিয়ে, করিডোর ধরে রেডিয়োলজি রুমের দিকে ছুটে গেল জনকরাম। পরমুহূর্তেই পার্বতীয়ামাসির গলা থেকে আর্তনাদের পর আর্তনাদ উঠে এসে মেটারনিটি-সেন্টারের চৌহদ্দির বাতাস ভারী করে তুলল। অল্প যে-কয়েকজন পথচারী মজা দেখার জন্যে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা যে যার মতন জোর পায়ে হাঁটা লাগাল উলটোবাগে। ওদের মতন আমিও বুঝতে পারছিলাম, এইবার মৃত্যুর অধিক এক খেলা শুরু হতে চলেছে।

হঠাৎই পার্বতীয়ামাসির আর্তনাদ থেমে গেল। জনকরাম ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওর লোকেদের কী যেন বলল, আর তারাও ব্যস্ত পায়ে চলে গেল মেটারনিটি-সেন্টারের পেছনদিকে সেই পুরোনো বাড়িটার দিকে। জনকরাম বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই আমি দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকলাম রেডিয়োলজি রুমের ভেতরে। দেখলাম, পার্বতীয়ামাসি মুখ থুবড়ে মেঝের ওপরে পড়ে রয়েছে। ওকে টেনে সোজা করে শোয়াতেই দেখতে পেলাম সারা মুখে রক্তআঁচড়ের কাটাকুটি। বুঝলাম, যতক্ষণ ওর কাছ থেকে সন্তোষজনক স্বীকারোক্তি না পেয়েছে, ততক্ষণ জনকরাম একটা সার্জিকাল স্ক্যালপেল দিয়ে ওর মুখে আঁচড় কেটে গেছে। শেষ অবধি আর সহ্য করতে না পেরে পার্বতীয়ামাসি এমন কোনো একটা কথা বলে ফেলেছে, যেটা শুনে জনকরাম মহুয়ার হদিস পেয়ে গেছে।

পার্বতীয়ামাসির উন্ডগুলো সুপারফিসিয়াল ছিল। চাকুশিল্পী জনকরাম ওকে ভয় দেখানোর বেশি আর কিছু করতে চায়নি, তাই হালকা হাতে স্ক্যালপেল টেনেছে। আমি চটপট মাসির মুখের সেই ক্ষতগুলো ড্রেস করে দিয়ে ওকে একটা বেডে শুইয়ে দিলাম। মাসি তখন অচৈতন্য। একটা জোরালো শক লেগেছে তো, ট্রমা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগবে। সেন্টার থেকে বেরিয়ে পেছনের বাগানে নিজের কোয়ার্টারে ঢুকে কাজের মেয়েটাকে বললাম, চট করে একটু দুধ গরম করে মাসিকে খাইয়ে দিয়ে আয় তো। আস্তে আস্তে যত্ন নিয়ে খাওয়াবি, হড়বড়ি করবি না।

আমার কথা ভালো করে শেষ হওয়ার আগেই সেন্টারের পেছনদিক থেকে প্রবল উল্লাস-ধ্বনি ভেসে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে জানলায় দাঁড়ালাম। এখান থেকে ভাঙা বাড়ি সমেত পেছনের জমির পুরোটাই দেখা যায়।

দেখলাম আশ্চর্য এক কাণ্ড শুরু করেছে জনকরামের লোকজনেরা। ভাঙা বাড়িটার যে-কটা জানলা খোলা ছিল, সেগুলোর সামনে ওরা বাদুড় ধরার জাল টাঙিয়ে ফেলেছে। তারপর ভিজে খড়ের আঁটিতে আগুন ধরিয়ে ফাঁক-ফোকরের মধ্যে দিয়ে বাড়িটার ভেতরে ধোঁয়া ঢোকাতে শুরু করেছে। খড়ের আঁটিতে কোনো কেমিক্যাল মিশিয়ে দিয়েছিল নিশ্চয়ই, কারণ ওরকম বিষাক্ত গন্ধ শুধু খড়ের ধোঁয়ায় হয় না।

দেখলাম, পরপর চারটে বাদুড় ভাঙা জানলার মধ্যে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল, আর বেরিয়ে এসেই জড়িয়ে গেল জালের মধ্যে। আমি ওদের চিনি। এরা ছানা বাদুড়। চারটিই ভাই-বোন। ওদের ফ্যামিলিতে এই চারজন ছাড়া রয়েছে ওদের বাপ-মা।

বাপ-মায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই মাঝারি সাইজের মা-বাদুড়টা বেরিয়ে জালে আটকা পড়ল। তার মানে বাকি রইল শুধু পুরুষ বাদুড়টা। এবার নিশ্চয়ই সেটা বেরোবে।

হঠাৎ আমার পাশ থেকে চূড়ান্ত অবাক গলায় কে যেন বলে উঠল —ও মোরি মাইয়া রে! ও কওন নিকাল রহি হ্যায় পিছেসে?

পাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমার কাজের মেয়েটা তখনও পার্বতীয়ার কাছে গিয়ে উঠতে পারেনি। গোলমালের শব্দে সে কখন যেন আমার পাশের জানলাটার গরাদে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মেয়েটা কী দেখে এত অবাক হল?

ওই আমাকে আঙুল তুলে দেখাল - দেখিয়ে জি, ওহি পিছাবালা খিড়কি দেখিয়ে।

দেখলাম ঘন ধোঁয়ার আড়ালে কখন যেন ভাঙা বাড়িটার পেছনদিকের একটা জানলা কে আস্তে আস্তে খুলে ফেলেছে। সেই গরাদভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে দুটো হাত খুব সাবধানে, খুব যত্নে যে মেয়েটাকে বাইরের জমিতে নামিয়ে দিচ্ছে সে আর কেউ নয়, মহুয়া সিং।

মাটিতে পা দিয়েই মহুয়া দৌড়োল পেছনের জঙ্গলটার দিকে। কিন্তু বাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা অতজন শিকারির চোখ এড়িয়ে তার পক্ষে পালানো সম্ভব ছিল না। পালাতে পারল না মহুয়া। জনকরাম নিজে এগিয়ে এসে ওর ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে সামনের রাস্তার দিকে নিয়ে চলল। মহুয়া কিছুতেই যাবে না। ও বারবার মাটিতে পা গেঁথে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। চিৎকার করে কাঁদছিল। প্রাণপণে জনকরামের হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চাইছিল ওই বাড়িটার দিকে, যেন ওখানেই রয়ে গেছে তার প্রাণ।

আমার বাংলোর পাশ কাটিয়ে সামনের বড়ো রাস্তার দিকে মোড় নেওয়ার আগে গলা তুলে জনকরাম তার চ্যালাদের উদ্দেশে হুকুম দিল, আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম — আব যো বাকি রহ গ্যায়া, উসকো পুরা খাল্লাস কর দো। পরের কথাগুলো মহুয়ার বুকফাটা আর্তনাদে চাপা পড়ে গেল।

আমি আবার ভাঙা বাড়িটার দিকে তাকালাম। দেখলাম, একটা কমবয়েসি ছেলে, মানে এই বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে, জানলার ফ্রেমের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। যেন এক্ষুনি লাফ মেরে পালাবে।

এই ছেলেটাই তাহলে একটু আগে ভেতর থেকে যত্ন করে মহুয়াকে বাইরে নামিয়ে দিয়েছিল?

এ-ও দেখলাম যে, বাবলু মান্ডি মাটির ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে, খুব যত্ন নিয়ে চোখের সামনে ধনুকটাকে তুলে ধরে, ছেলেটার দিকে টিপ করছে।

ছেলেটা লাফ মারার আগেই 'টং' করে ধনুকের ছিলা ছেড়ে দেওয়ার শব্দ হল আর ছেলেটাও যেন স্লো মোশনে জানলার ওপর থেকে আবার ঘরের ভেতরে উলটে পড়ল। হোওও হোওও আওয়াজ তুলল শিকারির দল।

ছেলেটা তারপরেও আরও কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল। মনে হয় বাবলু ইচ্ছে করেই বুকে কিংবা মাথায় না মেরে তিরটা মেরেছিল তার বাঁ কাঁধের ওপরে, যাতে সে আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকে। তিরের ফলাটুকু মাংসের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল আর কাঠিটা ছিপের ফাতনার মতন উঁচু হয়ে জেগে ছিল বাইরে। ভয়ে আর যন্ত্রণায় আধমরা ছেলেটা যখন একবার এ-জানলা, একবার ও-জানলায় দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন অবিকল ফাতনার মতনই তিরতির করে কাঁপছিল ওই কাঁধের কাঠিটা। যতবারই ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরোবার চেষ্টা করছিল, ততবারই জনকরামের লোকেরা তাকে তরোয়াল কিংবা বল্লমের খোঁচা মেরে আবার ঢুকিয়ে দিচ্ছিল ঘরের ভেতরে। শেষকালে ওরা জানলার ফাঁক দিয়ে কয়েক টিন পেট্রোল ঢেলে দিল বাড়িটার ভেতরে। নিখুঁত লক্ষে কয়েকটা জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে দিল।

ছেলেটা ভেতরেই রইল। দাউদাউ আগুনে জ্বলে উঠল আমাদের পুরোনো মেটারনিটি-সেন্টার। জনকরামের লোকেরা পাঁচটা বাদুড়কে জাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ট্রেকারে উঠে চলে গেল দারুখানার দিকে।

আমি আজ ঘরে যাই ডাক্তারসাহেব? শরীর, মন কিছুই ভালো লাগছে না। আমার পেছন থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় অনুরোধ ভেসে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, পার্বতীয়ামাসি কখন যেন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বললাম, যাবে বইকি, নিশ্চয়ই যাবে। রাতে কোনো পেশেন্ট এলে আমি সামলে নেব। তবে তার আগে একবার ভেতরে এসে ওই চেয়ারটায় বোসো। আমাকে বলো তো, ছেলেটা কে ছিল?

পার্বতীয়ামাসি বিধ্বস্ত শরীরটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়ে বলল, মহুয়ার আশিক। ওর কলেজে কয়েক ক্লাস ওপরে পড়ত। যদি জনকরাম বন্দুক দেখিয়ে মহুয়াকে তুলে না আনত তাহলে ওর সঙ্গেই মহুয়ার শাদি হত।

ওরা তোমার হেল্প চেয়েছিল?

পার্বতীয়ামাসির গলার স্বর থেকে হঠাৎই কাঁপুনি বিদায় নিল। খুব স্থির শান্ত স্বরে সে বলল, হ্যাঁ। ওরা যদি পালিয়ে যেতে পারত তাহলে আমার মরতেও আপশোশ ছিল না, স্যার। কিন্তু সে তো হল না। মোক্ষম সময়ে রেন্ডি কা আওলাদ এখানে এসে হাজির হয়ে গেল।

একটু থেমে পার্বতীয়ামাসি বলল, কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। আমি কিন্তু সরপঞ্চকে একটা কথাও বলিনি। যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ বার করিনি। তবু কেমন করে ওদের ধরল কে জানে!

আমি বললাম, তোমার কিছু না বলার মধ্যেও কি অনেকটা বলা ছিল না, মাসি? জনকরামের মতন ধূর্ত লোক ওতেই কনফার্মড হয়ে গিয়েছিল, দেয়ার ইজ সাম গড়বড়। আর তারপর খোঁজার জায়গা তো পড়ে থাকে ওই একটাই। চারিদিকে ধু-ধু পাথুরে ডাঙার মধ্যে ওই একটাই তো লুকোবার জায়গা।

নিজের মনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে মাসি বিদায় নিল। একটু পরে আমার রাতের খাবার তৈরি করে দিয়ে কাজের মেয়েটাও চলে গেল নিজের বাড়ি। খাওয়ার পাট নমো নমো করে মিটিয়ে আমি চেয়ারটা ওই জানলার ধারে টেনে নিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আজ আর ঘুম আসবে না। জীবনে এই প্রথম মানুষ খুন হতে দেখলাম, তাও এমন বীভৎস পন্থায়।

আমার অনিদ্র চোখের সামনেই আস্তে আস্তে আগুন নিভে অঙ্গার হল, অঙ্গার নিভে ছাই। চারিপাশের তেতে ওঠা বাতাসের স্তর কাঁপছিল বলেই মনে হচ্ছিল বাড়িটাও যেন অল্প অল্প দুলছে। আকাশ আলো করে রুপোর থালার মতন বড়ো একটা চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রের নীচে একটা তলিয়ে যাওয়া জাহাজের মতন কেঁপে উঠছিল সেই বাড়িটা। ফ্যাকাশে ধোঁয়ার কয়েকটা সরু রেখা ওই পোড়া-বাড়ি থেকে আমার জানলার দিকে ভেসে আসছিল; সঙ্গে নিয়ে আসছিল পোড়া কাঠের গন্ধ, জ্বলে যাওয়া খড় আর পেট্রোলের গন্ধ আর ...কোনো ভুল নেই ...মাংস পোড়ার গন্ধ।

রাত দুটো নাগাদ অদ্ভুত একটা হাওয়া ছাড়ল। চারিদিকের পাথরের খাঁজের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় সেই এলোমেলো হাওয়া এমন একটা শব্দ তুলছিল যে, মনে হচ্ছিল দুই যুবক-যুবতি নিজেদের মধ্যে খুনশুটি করতে-করতে, চাপা গলায় হাসতে-হাসতে আমার জানলার নীচ দিয়েই ঘোরাফেরা করছে।

হঠাৎ সেই আওয়াজকে ডুবিয়ে দিয়ে আবার উথলে উঠল মহুয়ার সেই

বুকফাটা কান্না – আহা হা হা হা হা। আমি চমকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। মহুয়া! মহুয়া এত রাতে এখানে ফিরে এল কেমন করে? তারপরেই নিজের বোকামিতে নিজে হেসে ফেললাম। শেয়াল ডাকছে।

শেয়ালের প্রসঙ্গে মনে এল হতভাগ্য বাদুড়গুলোর কথা। আর বাদুড়ের প্রসঙ্গে এমন একটা কথা মনে পড়ল যে আমি চেয়ারের হাতলদুটো শক্ত করে চেপে ধরে সোজা হয়ে বসলাম। আমার মনে পড়ে গেল একটা দুটো তিনটে চারটে, হ্যাঁ, প্রথম ঝোঁকে চারটে বাদুড় বেরিয়ে এসেছিল। তারপর বেরিয়েছিল একটা – মা-বাদুড়টা। মোট পাঁচটা। কিন্তু পুরুষ-বাদুড়টার কী হল? সেটা বেরোল না কেন? মানুষ বাদে অন্য কোনো পশুর মধ্যে তো আত্মঘাতী হবার প্রবণতা নেই। ওই বাদুড়টা কেন বেরোনোর চেষ্টা করল না?

ওই যে মাংস পোড়ার গন্ধ ভেসে আসছে তার মধ্যে কি তাহলে শুধুই মহুয়ার প্রেমিকের মাংসই নেই? অন্য একটা প্রাণীর মাংসও রয়েছে?

ভাবতে ভাবতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম, সেই যে পেছনের জানলাটা, যে জানলা দিয়ে মহুয়ার প্রেমিক তাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছিল, সেই জানলাটার ফাঁক দিয়ে গলে একটা কালো পোশাক পরা মানুষ নেমে এল। নামার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। আগে মাথাটা ঝুঁকে পড়ল নীচের দিকে। তারপর হাতদুটো এগিয়ে এসে দেয়ালটাকে চেপে ধরল। তারও পরে কোমর থেকে পা অবধি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। চোখের ভুল কিনা জানি না, মনে হল যেভাবে দেয়াল বেয়ে টিকটিকি নামে, সেইভাবে লোকটা দেয়াল বেয়ে জমিতে নামল।

তারপরেও কিন্তু লোকটা উঠে দাঁড়াল না। ওইভাবেই চার হাতপায়ে দুলতে দুলতে কিছুটা গিয়ে একটা লোহার ড্রামের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসল।

সেদিন আকাশে যে এক আশ্চর্য জ্যোৎস্না ফুটেছিল সে-কথা তো আগেই বলেছি। লোকটাকে তাই এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম, শুধু চলাফেরা নয়, লোকটার অনেক কিছুই মানুষের সঙ্গে মেলে না। যেমন আমি তাকিয়ে থাকতেই থাকতেই ও লম্বা লিকলিকে একটা জিভ বার করে পুরো মুখটা চেটে নিল। এর আগে কোনো মানুষকে আমি নিজের চোখ, কপাল, কানের ওপর দিয়ে এইভাবে জিভ বুলিয়ে নিতে দেখিনি। তা ছাড়া ও যখন একবার পাশের দিকে মুখ ফেরাল, তখন

পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ওর এক কানের ফুটোর মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে অন্য কানের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

সবে যখন ভাবছি সারাদিনের চরম উত্তেজনায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তখনই সমস্ত রহস্যের ওপর এক বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে লোকটা, থুড়ি বাদুড়টা আকাশে ডানা মেলল। হ্যাঁ, লোক-টোক কিছু নয়, সেই পুরুষ বাদুড়টাই এতক্ষণ পরে পোড়া-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আমারও হিসেব মিলে গেল। বুঝলাম, বয়স ওই বাদুড়টাকে অন্যগুলোর থেকে কিছুটা বাড়তি বুদ্ধি দিয়েছে। বউ আর ছেলেমেয়েদের মতন ও ধোঁয়ার ভয়ে হুট করে বেরিয়ে আসেনি। এমনকি বাড়িটায় আগুন লাগার পরেও বেরোয়নি। হয়তো মেঝের নীচে কোনো ফাটলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল। এতক্ষণে চারিদিক জনশূন্য হবার পরে ও নির্বিঘ্নে বেরিয়ে চলে গেল। আর আমি ঘুম-চোখে ওটাকেই এতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম মানুষ!

আমি আর একবার আমার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাদুড়টা থালার মতন বড়ো চাঁদটার সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তার শরীরের সিল্যুয়েট দেখে মনে হচ্ছিল রুপোর পাতের ওপরে কাজল দিয়ে আঁকা একটা ছবি। এতক্ষণ অবধি গাছপালা বাড়িঘরের পটভূমিকায় যা চোখে পড়েনি, খোলা আকাশের সামনে দিয়ে জন্তুটা উড়ে যাচ্ছিল বলেই এখন সেটা চোখে পড়ল।

দেখলাম বাদুড়টার বাঁদিকের কাঁধ থেকে লম্বা কাঠির মতন একটা কিছু বেরিয়ে রয়েছে।

।। ছয় ।।

পুলিশ এনকোয়ারি-টোয়ারির কোনো গল্পই ছিল না কোথাও। খুন-খারাপি নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক এ তল্লাটে নেই। ঠিক একসপ্তাহের মাথায় পোড়া-বাড়িটার সামনে এসে নামল দু-লরি ভরতি মজুর। বেলচা কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে তারা কাজে লেগে গেল। শুনলাম, 'দুর্ঘটনায়' পুড়ে যাওয়া বাড়িটার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ওখানে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে একটা ভিডিয়ো হল বানানো হবে, হরিমিট্টি নিবাসীয়ো-কো মনোরঞ্জনকে লিয়ে।

আমি সেই কর্মযজ্ঞ দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, পরেরদিন যখন মহুয়া আসবে, তখন ওকে কেমন দেখব? এত বড়ো একটা ট্রমা... কাটিয়ে উঠতে পারবে তো মেয়েটা?

আশ্চর্য ব্যাপার। তার ঠিক তিনদিন পরে যখন মহুয়া এল, তাকে দেখে মনে হল যেন এক রাজেন্দ্রাণী। চোখমুখ কী যেন এক আনন্দে ঝলমল করছে। ও আমার সঙ্গে যেচেই কথা বলল। বলল, গুড-ইভনিং ডাক্তারসাব। কেমন আছেন? আপনার সেই কলকাত্তাবালি গার্লফ্রেন্ড কেমন আছে?

বললাম, গুড ইভনিং। সবাই ভালো আছি। তোমাকেও তো দেখে বেশ ফ্রেশ লাগছে। আমার নতুন ওষুধটায় বোধহয় ঘুম ভালোই হচ্ছে, তাই না?

মহুয়া ভারি লাস্যময়ী ভঙ্গিতে বলল, দাবাই আপকা গেল ভৈঁসা পানি মে।

মতলব?

খিলখিল করে হেসে উঠল মহুয়া। বলল, মানে, কোনো কাজই হয়নি। কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। একটা বাদুড় সারারাত আমার জানলার বাইরে ওড়াউড়ি করছিল আর আমাকে অসভ্য অসভ্য সব কথা বলছিল।

একটু চুপ করে থেকে মহুয়া স্বপ্নমাখা গলায় বলল, অসভ্য হলেও কথাগুলো খুব সুন্দর। আমি আপনাকে বলতে পারব না সেসব কথা।

মহুয়ার কথা বলার ভঙ্গি, ওর হাসি, সবই একটু অস্বাভাবিক লাগছিল।

গলায় যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য এনে বললাম, ঠিক আছে। তুমি কলেজে পড়া মেয়ে। সেক্স-ফ্যান্টাসি কাকে বলে সেটা নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। কিন্তু রাত জাগাটা ঠিক নয়। শুয়ে পড়ো।

অন্যান্যবার এই চেক-আপের সময়ে মহুয়ার মধ্যে যে আড়ষ্টতা দেখি, আজ তার কিছুই দেখলাম না। নিজেই বেশ স্বচ্ছন্দ পায়ে সরু খাটটার ওপর উঠে শুয়ে পড়ল। নিজেই পা থেকে গলা অবধি একটা সাদা চাদর টেনে নিল। আমি তো আমি। পার্বতীয়ামাসি অবধি ওর এই ট্রান্সফর্মেশন দেখে অবাক।

আমি হাতে ডিসপোজেবল গ্লাভস দুটো পরে মহুয়ার দিকে এগোলাম।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছিল। চারিদিকের পাথুরে মালভূমি থেকে রাশি রাশি কুয়াশা উঠে এসে কুসুমডি গ্রামটাকে ঢেকে দিচ্ছিল। অনেক দূরে সুখবাসিয়ার মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছিল এটুকুও পরিষ্কার মনে আছে আমার।

হঠাৎই জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে এল একটা বাদুড়, বিশাল একটা বাদুড়। জানলার মোটা গরাদ পেরিয়ে সেই প্রাণীটা কেমন করে ঘরে ঢুকল তা আজও বুঝতে পারি না। নিঃশব্দে দুটো চক্কর কেটে বাদুড়টা সিলিং-এ পা আটকে মাথা নীচে ঝুলিয়ে দুবার দোল খেল। সট সট করে গুটিয়ে নিল নির্লোম লালচে চামড়ায় ঢাকা ডানা।

অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম কামার্ত পুরুষ হাতির মদস্রাবের কথা। মিলনের ঋতুতে গজরাজের কানের পাশে দুটো গ্ল্যান্ড থেকে নাকি গলগল করে বেরিয়ে আসে একরকমের রস। ঝাঁঝালো তার গন্ধ। বাদুড়েরও কি সেরকম কোনো গ্ল্যান্ড থাকে? জানি না। কিন্তু এই বাদুড়টার কানের পাশ দিয়েও রস গড়িয়ে নামছিল। আর কী অদ্ভুত তার গন্ধ।

কী মিষ্টি, কী তীব্র সেই গন্ধ আমি বলে বোঝাতে পারব না। এমন মিষ্টি কিন্তু একইসঙ্গে পচনের ছাপধরা গন্ধ একমাত্র চড়া রোদের দুপুরে কোনো ফলবাজারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে তবেই পাওয়া যায়। আমিও পেতাম, যখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ক্লাস সেরে, মেছুয়ার ফলপট্টির নোংরা ফেলার ভ্যাটগুলোর পাশ কাটিয়ে, আমাদের হোস্টেলে ফিরতাম। পাহাড়প্রমাণ পচা কলা, থ্যাঁতলানো আনারস আর নষ্ট মৌসম্বি-লেবুর গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে উঠত।

সেদিনও আমার মাথা টলমল করে উঠল। আমি জ্ঞান হারালাম।

পরে পার্বতীয়ামাসি বলেছিল, ওরও ঠিক একইরকমের অনুভূতি হয়েছিল।

মোট কথা, কিছুক্ষণের জন্যে যে আমি আর পার্বতীয়ামাসি দুজনেই সেন্স হারিয়েছিলাম তাতে কোনো ভুল নেই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম আমি একটা চেয়ারের ওপরে বসে আছি। পার্বতীয়ামাসি বসে আছে ঘরের কোণে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। আর মহুয়া একইভাবে সেই পেশেন্ট দেখার সরু খাটটার ওপরে শুয়ে আছে। ঘরের কোথাও বাদুড়ের

কোনো চিহ্ন নেই। সেই গন্ধটাও ততক্ষণে অনেক ফিকে হয়ে এসেছে।

আমি তাড়াহুড়ো করে উঠে আগে নিজের গা হাত-পা দেখলাম। কোথাও কোনো কাটা-ছেঁড়া দেখলাম না। পার্বতীয়ামাসিও ঠিক তখনই একটা হাই তুলে সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, কী আশ্চর্য! ডিউটির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাম রাম!

পায়ে পায়ে মহুয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম। ও কেমন আচ্ছন্নের মতন ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল। আমি ওর খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, মহুয়া, আমার শরীরটা বোধহয় একটু খারাপ হয়েছিল। বাট নাও আই অ্যাম ওকে। তুমি ঠিক আছো তো?

মহুয়া আমার দিকে না তাকিয়েই খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলল, আই হ্যাভ বিন রেপড।

তারপর আমার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, — ওঃ, নো। ইউ ক্যাননট কল ইট রেপ, ডক্টর। বিকজ আই হ্যাড মাই কনসেন্ট। পুরো ব্যাপারটাতেই আমার সম্মতি ছিল। ইন ফ্যাক্ট, ডাক্তারসাব, এমন তীব্র সুখ এর আগে কোনোদিন পাইনি। কিন্তু এখন আমি বাড়ি যাব। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমোব।

বুঝতে পারছিলাম, মহুয়ার মাথার ঠিক নেই। হ্যালুসিনেশনটা যে এত তাড়াতাড়ি এমন পর্যায়ে চলে যাবে তা ভাবতে পারিনি। ওর পেটের বাচ্চাটা কেমন আছে? মহুয়া নয়, বাচ্চাটার ভালোমন্দের ওপরেই যে আমার আর পার্বতীয়ামাসির বাঁচামরা নির্ভর করছে সে-কথা ভুলিনি তখনও।

আমি মহুয়ার আরও একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ওর গায়ের চাদর মাটিতে লুটোচ্ছে। শাড়ি উঠে গেছে উরুর ওপরে। আমি বললাম, ওয়েট। তোমার চেক-আপ বাকি আছে। লেট মি ফিল ইওর বেবি। এই বলে ওর ভ্যাজাইনার মধ্যে দিয়ে আমার গ্লাভস পরা হাতের আঙুল চালিয়ে দিয়েই যেন ফোর ফর্টি ডিগ্রি ইলেক্ট্রিকের শক খেলাম। রেপ কিনা জানি না। কিন্তু ওই যোনিপথ যে একটু আগেই সংগমের স্বাদ পেয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। আমার চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত আঙুলের ডগায় ধরা পড়ছিল বীর্যের পিচ্ছিলতা, সংগোমোত্তর যোনিপ্রাচীরের শিথিলতা, এমনকি পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম, মহুয়ার ভগাঙ্কুর তখনও লেবিয়ার আড়াল ছেড়ে স্বস্থানে ফিরে আসেনি।

এর অর্থ হয়, এইমাত্র... কয়েক মিনিট আগেই ও সংগত হয়েছিল। কিন্তু হায় ভগবান! তা কেমন করে সম্ভব? এই ঘরে আমি ছাড়া পুরুষ কোথায়?

পার্বতীয়ামাসি ইতিমধ্যে মহুয়ার ব্লাউজ আর ব্রা সরিয়ে দিয়ে, মন দিয়ে ওর স্তনের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল। মহুয়ার মধ্যে কোনো বিকার ছিল না। এমনকি আমি যখন ওর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লাম, তখনও ও নির্বিকার। একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলাম পার্বতীয়ামাসি কী দেখছিল। মহুয়ার বুকের ওপর অনেকখানি তফাতে সমান্তরাল দুটো আঁচড়ের দাগ। ধারালো নখের আঁচড়। ওই নখরাঘাত মানুষের নয়। একমাত্র সেই-ই এমন আঁচড় কাটতে পারে যার প্রতি হাতের একটা মাত্র আঙুলে নখ থাকে। দু-হাতে দুটো।

বাদুড়ের ডানাদুটো যে আসলে চামড়ায় মোড়া হাতের আঙুল সেটা জানতাম, আর জানতাম সেই চামড়ার মোড়কের বাইরে বেরিয়ে থাকে কেবলমাত্র বুড়ো আঙুলের বাঁকানো হুকের মতন নখ।

মহুয়ার বুকের রক্ত তুলো দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে পার্বতীয়ামাসি আপনমনেই বলে উঠল, কার মুক্তি যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তা কি কেউ বলতে পারে?

কথাটার মানে বুঝলাম না।

জানলার নীচে মেঝেয় একটা জ্যোৎস্নার চৌখুপি পড়ে ছিল। সেই চৌখুপির ওপর দিয়ে বিদ্যুতগতিতে সরে গেল একটা ছায়া, একটা বাদুড়ের ছায়া। চাঁদের সামনে দিয়ে উড়ে যেতে যেতে জন্তুটা তীব্র উল্লাসে ডেকে উঠল ক্রাও ক্রাওওও।

এই পর্বে শুধু আর একটা কথাই বলার আছে।

এর মধ্যে একদিন কী যেন একটা পরব পড়েছিল। সেদিন মিস্ত্রিরা বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ রেখেছিল। আমি সকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে এমনিই বাড়িটার দিকে চলে গিয়েছিলাম। একেবারে আচমকাই মেঝের একটা ফাটলের মধ্যে থেকে খুঁজে পেয়েছিলাম একটা বাদুড়ের আধপোড়া মাথা। ছোট শেয়ালের মতন মুখ, গেরুয়া চামড়ায় ঢাকা। জিভ কিংবা চোখের মতন নরম জায়গাগুলো পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ধারালো ছুরির মতন চারটে শ্বদন্ত অক্ষত ছিল। আমি জিনিসটাকে বাড়ি নিয়ে

এসে এক শিশি ফর্মালিনের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, যখন কুসুমডি ছেড়ে চলে যাব, তখন ওই আধপোড়া মাথাটা আমাকে অনেকদিন আগের আশ্চর্য কিছু দিনরাত্রির কথা মনে পড়িয়ে দেবে।

।। সাত ।।

পনেরো দিন বাদে মহুয়া আবার এক সন্ধেবেলায় আমাদের মেটারনিটি-সেন্টারে চেক-আপের জন্যে এল। মহুয়া সন্ধেবেলাতেই আসে; অন্য সব পেশেন্ট ফিরে যাওয়ার পরে জনকরাম ওকে নিয়ে আসে।

ওর তলপেটটা দেখলাম অস্বাভাবিক রকম ফুলে উঠেছে । ওজনও বেড়েছে যতটা বাড়া উচিত ছিল তার থেকে অনেক বেশি। পেটের ওপরে স্টেথো বসিয়ে চমকে উঠলাম। একবার কান থেকে স্টেথোটা খুলে নিয়ে ভালো করে মুছে আবার কানে লাগালাম। যা শুনেছিলাম তাই আবার শুনলাম। দুটো হৃৎপিণ্ডের লাবডুব। আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? ক্লিনিকাল ইনভেস্টিগেশন কি ভুলে যাচ্ছি? উত্তর পাওয়ার একটাই উপায় – আল্ট্রা-সোনোগ্রাফি।

না, স্টেথোর আওয়াজ আমাকে যা বলেছিল তাই ঠিক। ওই তো, মনিটারের স্ক্রিনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মহুয়ার জরায়ুর ভেতরে দুটো ভ্রূণের নড়াচড়া। একটা আমার ছমাসের চেনা মেল-বেবির ভ্রূণ। কিন্তু ঠিক তার পিঠের কাছে সদ্য গজিয়ে ওঠা অন্য ভ্রূণটা নতুন। পনেরো দিন আগেও ও ছিল না, থাকার কথাও নয়। প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের মধ্যে একজন মেয়ে কখনোই দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট হতে পারে না, তা তার যোনিপথে যতই শুক্রাণুর জোগান থাকুক না কেন। প্রেগন্যান্ট হবার জন্যে শুক্রাণুর সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুরও তো প্রোয়োজন। প্রেগন্যান্সির মধ্যে মেয়েদের শরীর থেকে ডিম্বাণু মোচন হয় না।

এসব জীববিদ্যার প্রথম পাঠ। ক্লাস ইলেভেন কিংবা টুয়েলভের সিলেবাস। কিন্তু নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। ওই স্ক্রিনের ছবিতে যে জীববিদ্যা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে।

পার্বতীয়ামাসি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে ছিল। হাপরের মতন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল ওর। আমার সঙ্গে

চোখাচোখি হতেই হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, বলেছিলাম না আপনাকে, কার মুক্তি কোথায় লুকিয়ে থাকে কেউ জানে না।

চরম অস্বস্তি নিয়ে সেদিন মহুয়াকে ছেড়ে দিলাম। জনকরামকে বললাম, ঠিক সাতদিন পরে আর একবার আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন।

জনকরাম বলল, কেন ডাক্তার? কোনো লাফড়া হল নাকি?

আমি বললাম, না না। দেখছেন তো সব ঠিক আছে। ওয়েট বেড়েছে। ব্যথা নেই, ব্লিডিং নেই। লাফড়া হলেই হল?

সাতদিন পরে মহুয়াকে বিছানায় শুইয়ে ক্লিনিকাল ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করলাম। বললাম, হাঁ করো। জিভ দেখাও। মহুয়া হাঁ করতেই ফলের গন্ধ পেলাম। গন্ধটা ওর শরীরের ভেতর থেকে আসছিল। সেই ঘোর লাগানো ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ। আগের দিনের অভিজ্ঞতা ভুলিনি। তাই সাবধানতা হিসেবে নাকের ওপরে একটা মাস্ক পরে নিলাম। তারপর মহুয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ফল খেয়েছিলে নাকি?

হুঁ, উত্তর দিল মহুয়া। ফল-ই তো খাই। অন্য কিছু খেতে ভালো লাগে না।

আমি বললাম এরকম করলে তো হবে না। ব্যালেন্সড ফুড খেতে হবে তো। একটু দুধ, মাছ...

কথা বলতে বলতেই আমি আল্ট্রা-সোনোগ্রাফির জন্যে মহুয়াকে তৈরি করে নিয়েছিলাম। স্ক্রিনের ওপরে ওর জরায়ুর ভেতরের ছবি ফুটে উঠতেই বুঝতে পারলাম, আর কোনো কিছু খাইয়েই লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। মেল-বেবির ভ্রূণটা শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। তার ঠিক ঘাড়ের ওপরে ঝুলে রয়েছে নতুন ভ্রূণটার মুখ।

'ঝুলে আছে' বলছি, কারণ সত্যিই অদ্ভুতভাবে জরায়ুর দেয়ালে পা লাগিয়ে ঝুলে ছিল ওই নতুন ফিটাসটা। এটাও জীববিজ্ঞানের বিরোধী ঘটনা। জন্মের আগের মুহূর্ত অবধি ভ্রূণের মাথা ওপরের দিকে, মানে মায়ের বুকের দিকেই থাকে। ঠিক জন্মমুহূর্তে কেমন করে যে ভ্রূণ একটা ডিগবাজি খেয়ে বার্থ ক্যানালের মধ্যে মাথা নামিয়ে আনে – কেন, কার প্ররোচনায় যে সে ওই একান্ত এসেনশিয়াল ডিগবাজিটা খায় – তা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাহীন রহস্যগুলোর মধ্যে একটা। এই ভ্রূণটা কিন্তু প্রথম থেকেই মাথা নীচু করে ঝুলছে।

ঝুলছে ঠিক একটা বাদুড়ের মতন।

ঘরের আলোটা হঠাৎ দুবার দপ দপ করে উঠে নিভে গেল। নিভে গেল ইউ এস জি মেশিনের আলোকিত মনিটর। বাইরের অধিত্যকার অন্ধকার যেন লাফ মেরে ঢুকে এল ঘরের মধ্যে আর তার সঙ্গেই ঢুকে এল গাঢ়তর অন্ধকার দিয়ে গড়া একটা বিশাল পাখির মতন শরীর। তীব্র ক্রাও ক্রাওওও উল্লাসধ্বনিতে ভয় পেয়ে আমি দুহাতে মাথা ঢেকে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম মেঝের ওপরে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই ফিরে এল আলো। একটা ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে আমি প্রথমেই সিলিং-এর দিকে তাকালাম। না, বাদুড় নেই। তারপর তাকালাম পার্বতীয়ামাসির দিকে। দেখলাম মাসির ঠোঁটের ফাঁকে একটা দুর্বোধ্য হাসি। হাসি ফুটেছিল মহুয়ার শুকনো দুই ঠোঁটের ভাঁজেও। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হল না। ওর ফরসা গালের ওপরে একটা লাল চুম্বনের দাগ ফুটে উঠেছে। অবিকল মানুষের ঠোঁটের মতনই সেই দাগ, বাড়তির মধ্যে ঠোঁটের দাগের মাঝখানে ওপরে দুটো আর নীচে দুটো সুঁচের ফুটোর মতন ক্ষতচিহ্ন। আন্দাজ করা কঠিন নয়, ওগুলো শ্বদন্তের দাগ।

তাহলে কি আসন্ন পিতৃত্বের আনন্দে সেই বাদুড়টা মহুয়াকে চুম্বন করে গেল?

মহুয়া চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল। খুব আস্তে ডাকল, ডাক্তারসাব! এই প্রথম ওর গলায় ঘৃণার বদলে একটা অন্য কিছুর আভাস পেলাম। অনেকটা যেন বাচ্চাকে ভোলানোর মতন আদুরে গলায় ও আবার বলল, দুঃখ পেয়ো না ডাক্তারসাব। দেখো, যে বাচ্চাটা আমার পেটের ভেতরে মরে যাচ্ছে, সে তো মরতই, তাই না? অনেক কষ্ট পেয়ে মরত। তার চেয়ে এই কি ভালো হল না?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

মহুয়া আবার বলল, ডাক্তারসাব জানো? সুখবাসিয়ায় নদীর ধারে আমার পিতাজির কলাবাগান ছিল। সেই কলাবাগানে বাদুড় আসত। তারা অনেক কলা খেয়ে যেত। আমরা ভাইবোনেরা তাই নিয়ে রাগারাগি করলে পিতাজি আমাদের বলতেন, রাগ করিস না বিটিয়া। বাদুড়েরা নষ্ট ফলগুলোই শুধু খেয়ে যায়। ভালো ফলে ওরা মুখ দেয় না। ওরা আসলে বাগিচাকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখে।

আমাকেও ওই বাদুড়টা বাঁচিয়ে দিয়ে গেল ডাক্তারসাব। অ্যাবরশনের যন্ত্রণা নেই, রক্তপাত নেই। অথচ আমার গর্ভের ভেতরের নষ্ট ফলটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই না?

আমার উত্তর দেওয়ার মতন কিছু ছিল না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারলাম, তুমি কি সরপঞ্চকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে?

মহুয়া বলল, নিশ্চিন্ত থাকো, আমি কিছু বলব না। কারণ, তোমার মতন একটা মেরুদণ্ডহীন পোকাকে যদি সরপঞ্চ খুন করে, তাতে আমি কোনো আনন্দ পাব না।

শুকনো গলায় বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর পার্বতীয়ামাসিকে বললাম, একটা টেডভ্যাকের শট রেডি করতে। মহুয়া বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্লিপার গলাতে গলাতে বলল, থাক। প্রেমিকের চুমুতে কেটে-ছড়ে গেলে কোনো মেয়ের টিটেনাস হয় না। তারপর একা একাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল, যেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে জনকরাম সিং।

অবশেষে সেই দিনটা এসে গেল। আমি জানতাম, আমার মন বলছিল মহুয়ার ব্যথা উঠবে খুব অন্ধকার কোনো রাতে। তাই হল। রাতটা ছিল মাঘমাসের অমাবস্যা। যেমন অন্ধকার, তেমনি ঠান্ডা আর তেমনই ঘন কুয়াশা নেমেছিল চারিদিকে। আশ্চর্য কাণ্ড, অমন যে দোর্দণ্ড প্রতাপ সরপঞ্চ, সে সেদিন একাই তার বউকে নিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করে এল। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, এমন রাতে একা এলেন যে!

জনকরামের গলায় এই প্রথম ভয়ের কাঁপুনি শুনতে পেলাম। বলল, সত্যনাশ হয়ে গেছে ডাক্তার। আমার উল্লুকা পাঁঠঠা শাগরেদগুলো কাল রাতে হাইওয়েতে একটা মেয়েকে রেপ করে খুন করেছে। মেয়েটা ছিল আমাদের ফিনান্স মিনিস্টারের ভাইঝি। বাবলু সমেত অলরেডি সাতজনকে সেন্ট্রাল ফোর্সের লোকেরা তুলে নিয়ে গেছে। বাকিদেরও খুঁজছে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আপনি?

নাঃ, আমি কোনোদিন এসব নোংরা কাজের মধ্যে নিজে থাকি না। আমার ভয় নেই। ঠিক আছে ডাক্তার। তুমি ভীতু মানুষ, এসব নিয়ে ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু হাতদুটোকে স্টেডি রাখো। আমার উত্তরাধিকারীকে সহি-সলামৎ পৃথিবীতে নিয়ে এসো। আমি

তোমার গোলাম হয়ে থাকব। আর যদি না পারো...। জনকরাম আমার গলার কাছে আড়াআড়ি হাতের চেটোটা ঘুরিয়ে আনল।

আধঘণ্টা পরের কথা। তখন রাত প্রায় নটা বাজে। মনে হচ্ছিল সৌরজগতের বাইরের কোনো গ্রহের মাটিতে ভেঙে পড়া স্পেশ-ক্যাপসুলের ভেতরে শুধু আমরা তিন মহাকাশচারী বেঁচে রয়েছি। বাইরের জগৎ এমনই নিশ্চুপ, এমনই অন্ধকার। লেবার-রুমের মধ্যে মহুয়া প্রসব-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এত ঠান্ডার মধ্যেও ঘামে ভেসে যাচ্ছিল ওর মুখ। পার্বতীয়ামাসি ঘরের একদিকে হিটারে গরম জল বসিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, প্রসবের আর দেরি নেই।

হঠাৎ লেবার-রুমের দরজা ঠেলে উঁকি দিল জনকরাম। আমি একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

জনকরাম আমতা আমতা করে বলল, আমি কি একটু ভেতরে এসে দাঁড়াতে পারি?

কেন? কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

না, মানে... একটা বাদুড় ভীষণ জ্বালাতন করছে। খ্যাপা কুত্তার মতন বারবার আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ মারছে। বাদুড়টার মুখটা অদ্ভুত। মানুষের মতন। একা বাইরে বসে থাকতে ভয় করছে।

মনে মনে ভাবলাম, একদিক দিয়ে ভালোই হল। আমি জানি না মহুয়া কেমন সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছে। কিন্তু সে সন্তান যেমনই হোক, জনকরাম নিজের চোখে দেখুক তার জন্ম। না হলে পরে হয়তো বলবে আমরা বাচ্চা পালটে দিয়েছি।

কিন্তু জনকরামের তখন যা অবস্থা তাতে ওর পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল হচ্ছিল। কী দেখে অত ভয় পেয়েছিল জানি না। জানি না কেমন ছিল সেই বাদুড়ের চেহারা, যে নাকি খ্যাপা কুত্তার মতন ওর ঘাড়ের দিকে ঝাঁপ মেরেছিল। বললাম, ঠিক আছে, এই ট্যাবলেটটা মুখে ফেলে দিয়ে ওই কোনার চেয়ারটায় গিয়ে বসুন। এই দৃশ্য দেখাটা একটু কষ্টকর। তবে আপনি তো সাধারণ মানুষ নন। মেয়েমানুষের যন্ত্রণা দেখার অভ্যেস আছে আপনার।

আমার মতন একটা কেঁচোর মুখে এরকম গরম গরম ডায়ালগ শুনে জনকরাম কেমন যেন ভেবলে গেল। পুরো এক গ্লাস জল দিয়ে

ট্যাবলেটটা পেটে চালান করে, হেঁ হেঁ করতে করতে আমার দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল। আমি দেখলাম ওইটুকু সময়ের মধ্যেই খোলা দরজাটার ফাঁক দিয়ে ঢুকে এসেছে রাশি রাশি ঘোলাটে কুয়াশা। দৌড়ে গিয়ে দরজার পাল্লাদুটো চেপে বন্ধ করলাম আর সেই মুহূর্তেই মহুয়ার উরুসন্ধির মাংসল পাল্লা খুলে গিয়ে মাথা বাড়ালো একটা জীব।

হ্যাঁ, মানুষের বাচ্চা নয়, একটা জীব। মানুষের চেয়ে নীচু স্তরের একটা প্রাণী। তার সারা মুখ বাদামি রোঁয়ায় ঢাকা। দুটো ছুঁচলো কান ওপরের দিকে খাড়া হয়ে রয়েছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখদুটো। যেন দুটো কুচকুচে কালো পুঁতি।

পার্বতীয়ামাসি উলটোদিকে ফিরে দেয়ালে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়েছিল। জনকরাম কী করছিল দেখিনি। বাচ্চাটাকে জন্মানোর সময় সাহায্য করার কেউ ছিল না, তবু সে নিজের চেষ্টাতেই পটলের মতন শরীরটাকে অনায়াসে যোনিপথ থেকে বার করে আনল। ভালো করে জন্তুটার দিকে তাকাতেই মনে হল আমার সারা শরীরে পক্ষাঘাত হল। দেখলাম, ওটার ধারালো দু-সারি দাঁতের ফাঁকে তখনও ধরা রয়েছে একটা বাচ্চার হাতের আঙুল – হ্যাঁ, মানুষের বাচ্চার। গর্ভভুক প্রাণীটা কুঁতকুঁতে চোখদুটো ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক চাইল। তারপরে হাতদুটো মাথার ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙার মতন একটা ভঙ্গি করতেই ছাতার মতন খুলে গেল চামড়ার ডানা। আর সেদিনের মতন সেই ঝিম ধরানো পচা ফলের গন্ধে আবার ভরে গেল ডেলিভারি রুম।

ক্লিক করে একটা জোরালো শব্দ হতেই কোনোরকমে মহুয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকালাম। দেখলাম জনকরাম তার পিরানের ভেতর থেকে কখন যেন একটা ফোল্ডিং চাকু বার করে এনেছে। শব্দটা ওই চাকুর ফলার খুলে যাওয়ার শব্দ। এর পরেই জনকরাম টলতে টলতে এগিয়ে গেল মহুয়ার বিছানার দিকে। তার মুখ ফ্যাকাশে, কিন্তু চোখদুটো কয়লার টুকরোর মতন জ্বলছিল। মহুয়া, ক্লান্ত-মহুয়া, খুব অস্ফুট স্বরে বলল, ক্ষমা করব না। এর বাবাকে তুমি পুড়িয়ে মেরেছ, কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু আমার এই বাচ্চার গায়ে যদি তুমি হাত দাও ক্ষমা করব না।

মহুয়াকে অবশ্য কিছু করতে হল না। বাদুড়ের বাচ্চাটা হঠাৎই অয়েলক্লথের ওপর থেকে উড়ে গেল সিলিং-এর দিকে। তারপর নিখুঁত একটা প্যারাবোলা এঁকে জনকরামের কণ্ঠনালি লক্ষ্য করে নেমে এল। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে জনকরাম লেবার রুমের দরজা খুলে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এর পরে আমি আর চোখ মেলে থাকতে পারিনি। পচা ফলের ঝাঁঝালো গন্ধে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

।। আট ।।

ডক্টর শর্মা! ডক্টর বেদব্রত শর্মা! চিনতে পারছেন? আমি আপনার ডিফেন্স ল-ইয়ার, অমিত কাশ্যপ।

মিটমিটে একটা আলো জ্বলছিল সেলটার মধ্যে। পেচ্ছাপের তীব্র গন্ধ। ডুমো ডুমো মাছি উড়ছিল গুমোট ঘরটার মধ্যে। গরাদের এপাশ থেকে অমিত কাশ্যপ আবার ডাক দিলেন, ডক্টর শর্মা, প্লিজ। আমি কিন্তু আপনার পক্ষে। আপনার কেসটা কাল কোর্টে উঠছে। আজ একবার কথা বলা খুব প্রয়োজন।

সেলের সবচেয়ে দূরের কোণটায় যে মানুষটি দুটো হাঁটু বুকের কাছে জড়ো করে বসে ছিলেন তিনি এবার মুখটা তুলে তাকালেন। গত এক মাসে তার তরুণ-মুখে বার্ধক্যের ছোপ ধরেছে। লালচে চোখদুটো কোনোরকমে খুলে বললেন, আবার কেন জ্বালাতে এসেছেন? আমার লিখিত এজাহার তো দিয়েছি আপনাকে।

ল-ইয়ার কাশ্যপ একবার হাতে ধরে থাকা কাগজের বান্ডিলটার দিকে তাকালেন। তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, প্রশ্নটা এই এজাহার নিয়েই। এর মধ্যে আপনি যা বলেছেন, তা কি কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব? এইসব বাদুড়-টাদুড়।

করবেন না। বয়েই গেল। বেদব্রত শর্মা আবার মুখটা হাঁটুর ভাঁজে নামিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন। কাশ্যপ তাড়াহুড়ো করে বলে উঠলেন – দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি এক-এক করে পুলিশের চার্জগুলো বলে যাচ্ছি। আর তার সঙ্গেই বলে যাচ্ছি আপনার লেখার মধ্যে গুঁজে দেওয়া উত্তরগুলো। আপনি নিজেই দেখুন এগুলো কোর্টে দাঁড়িয়ে বলা যায় কিনা।

সবচেয়ে সাংঘাতিক যে অভিযোগ, সেটা হল, জনকরাম সিং-কে খুনের অভিযোগ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে জনকরামের মৃতদেহ পড়ে ছিল। গলার পাশে জুগুলার ভেনে সরু কিন্তু গভীর দুটো ফুটো। ওই ফুটো দুটোর মধ্যে দিয়েই শরীরের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল।

ডক্টর শর্মা ক্লান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, ফুটো-দুটো কীভাবে হয়েছিল সে ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট আছে?

কাশ্যপ একটু ইতস্তত করে বললেন, হ্যাঁ, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলছে, কুকুর-শেয়ালের মতন কোনো প্রাণীর দাঁত গলায় বসে গিয়ে ওই গভীর ক্ষত হয়েছিল।

ডক্টর শর্মা পাগলের মতন দাঁত খিঁচোলেন। বললেন, দেখে নিন। আমার ক্যানাইন টিথ কাউকে কামড়ে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট বড় কি না।

না, ডক্টর। তা হয়তো নয়। কিন্তু আপনার কোয়ার্টার সার্চ করে পুলিশ একটা বাদুড়ের আধপোড়া খুলি পেয়েছে। একজন ডাক্তারের হাতে ওই বাদুড়ের খুলির দাঁতগুলো মোক্ষম অস্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। পারে না?

আমি ওরকম কিছু করিনি। মহুয়ার পেট থেকে বেরিয়ে আসা বাদুড়ের বাচ্চাটা মাঠের মধ্যে উড়ে গিয়ে জনকরামকে অ্যাটাক করেছিল। নাকি ধেড়ে বাদুড়টা... সেটাও তো বাইরে ওড়াউড়ি করছিল। বলতে পারব না।

অমিত কাশ্যপ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাতের ফাইলটার দিকে তাকালেন। বললেন, জনকরামের ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট আরো কী বলছে জানেন? ওনাকে হেভি ডোজে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। মনে হয় সেইজন্যেই যে ওকে খুন করেছে সে ধীরেসুস্থে গলায় ফুটো করার কাজটা করতে পেরেছিল। কোনো বাধা পায়নি। আপনার এজাহারে এক জায়গায় আপনি লিখেছেন, সেদিন ওই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে আপনি জনকরাম সিংকে নার্ভ স্টেডি রাখার জন্যে একটা ওষুধ দিয়েছিলেন। সেটা আসলে ঘুমের ওষুধ ছিল না তো? সত্যি কথা বলবেন ডক্টর শর্মা।

না। ওটা নার্ভ স্টেডি রাখার ওষুধই ছিল। কিন্তু জনকরাম, আমি, পার্বতীয়া – আমরা সকলেই যে ওই বাদুড়টার গা থেকে বেরোনো পচা ফলের গন্ধে সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলাম সে-কথা তো এজাহারে লিখেইছি।

তারপরেও এত প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

ল-ইয়ার কাশ্যপ কিছুক্ষণ. স্থির দৃষ্টিতে ডক্টর বেদব্রত শর্মার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, মহুয়ার বাচ্চাটা কোথায় গেল, ডক্টর শর্মা?

মহুয়া কী বলছে?

আপনাকে আগের দিনই বলেছি, মহুয়া ওই মেটারনিটি সেন্টারের বিছানাতেই মারা গিয়েছিল। ইউ শুড নো ইট। নাকি, ও মারা যাওয়ার আগেই আপনি ওর ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন?

আরে ধুর। কোথায় ছেলে? তাকে তো বাদুড়ের বাচ্চাটা খেয়েই ফেলেছিল।

অমিত কাশ্যপ মুখ দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে বললেন, বাদুড়ের বাচ্চা, তাই না? শুনুন ডক্টর শর্মা। পুলিশ কিন্তু আল্ট্রা-সোনোগ্রাফির মেশিনটা হার্ড-ডিস্ক সমেত সিজ করেছে। মহুয়ার গর্ভের শেষ যে ইমেজ-গুলো পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো ওর প্রেগন্যান্সির তিন মাসের মাথায় তোলা। একটাই ফিটাসের ছবি, ন্যাচারালি মানুষের ফিটাস। নর্মাল মেল-বেবির ফিটাস। তারপরে আর কিছুই নেই। অথচ আপনি লিখেছেন তার পরেও অন্তত আরও দুবার নাকি... যেখানে আপনি দেখেছিলেন ওর জরায়ুর মধ্যে দ্বিতীয় একটা বাচ্চা বেড়ে উঠছে।

শুনুন, শুনুন। কোনো এক রহস্যময় কারণে ওই বাদুড়ের বাচ্চাটার ছবি সিস্টেমে সেভড হত না। এটা আমি লিখতে ভুলে গিয়েছি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে পার্বতীয়ামাসিকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

ওই মিডওয়াইফ মহিলা যে পাগল হয়ে গিয়েছেন, সেটাও আপনাকে আগে বলেছি। মনে হয় খুনখারাপির দৃশ্য সহ্য করতে পারেন নি। মোটকথা উনি কিছু বলবার মতন অবস্থায় নেই।

ডক্টর শর্মা আর কোনো উত্তর না দিয়ে দু-চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন। অমিত কাশ্যপ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সেলের দুটো গরাদ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে দাঁড়ালেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, ডক্টর শর্মা। আমার কাছে লুকোবেন না। এমন কাজ করলেন কেন?

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর যখন বেদব্রত শর্মা কথা শুরু করলেন, তখন মনে হল কোনো ভূতে পাওয়া মানুষ ঘোরের মধ্যে কথা বলছে। চোখের ওপর থেকে হাত না নামিয়েই তিনি বলে চললেন, একদিকে

জনকরাম সিং বলেছিল তার ছেলে চাই... সহি সলামৎ। না পেলে আমি আর পার্বতীয়া মরব। অন্য দিকে মহুয়া নামে ওই মিষ্টি মেয়েটা, ওই দুঃখী মেয়েটা, আমার বোনের মতন ওই মেয়েটা চেয়েছিল তার গর্ভের সিফিলিস-আক্রান্ত বাচ্চাটাকে যেন মেরে ফেলি। আমি এই দুটো কাজকে একসঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না।

বেদব্রত শর্মাকে তার কথার মধ্যেই থামিয়ে দিয়ে ল-ইয়ার অমিত কাশ্যপ হাতের কাগজের বান্ডিলটা দিয়ে গরাদের ওপর ফটাস করে চাপড় মেরে উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন– ইয়েস। দ্যাটস দা পয়েন্ট! একদিকে জনকরামের খুনের হুমকি, অন্যদিকে আপনার বিবেক। এই উভয় সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আপনি মেন্টাল-ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর ডেলিভারির চূড়ান্ত চাপের মুহূর্তে হঠাৎ আপনার মনে হয়েছিল, বাপ আর ব্যাটা দুটোকেই খুন করলে সব সমস্যা মিটে যায়, তাই না?

ডক্টর বেদব্রত শর্মা এতক্ষণে চোখের ওপর থেকে হাতদুটো সরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে অমিত কাশ্যপের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যা একজন বাচাল উকিলকেও স্তব্ধ করে দেয়। অনেক দূর থেকেও শোনা যায় এমন গভীর গলায়, পরিষ্কার উচ্চারণে তিনি বললেন— না। আমাকে শেষ অবধি কিছুই করতে হয়নি। মহুয়ার প্রেমিকই ওকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এসেছিল।

একটা বাদুড় এসে যা করবার করে গিয়েছিল। আবারও বলছি শুনুন - একটা বাদুড়।

কিড়া-জড়ি



ড্যানিয়েল, তুমি প্লিজ একবার গোপীচাচার কাঠের ঘরটা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসো। হ্যাঁ, মানছি বাইরে ভীষণ ঠান্ডা; আজ সন্ধ্যায় তাপমান নিশ্চয়ই শূন্যের নীচে দশ কী এগারো ডিগ্রি নেমে গিয়েছে। এই ডিসেম্বর মাসে গাড়োয়াল হিমালয়ের দশ-হাজার ফিট ওপরের একটা উপত্যকায় সেটাই স্বাভাবিক। তবু বেরিয়ে এসো। এই ঠান্ডা শরীরের কোনো ক্ষতি করবে না।

এসেছ? লক্ষ্মীছেলে। এইজন্যেই তোমাকে এত ভালোবেসে ফেলেছি ড্যানিয়েল। তোমার আরামের জন্যে মিথিলানাথ বিস্ত নিশ্চয়ই গোপীচাচার ছেড়ে-যাওয়া কাঠের ঘরের ভেতরে কাঠের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার হাতের নাগালে রেখে দিয়েছে স্যালাডের প্লেট আর এই গাড়োয়ালেরই কোনো গ্রামের ঘরে বানানো অ্যাপ্রিকটের মদ, যাকে আমরা গাড়োয়ালিরা বলি 'আরু'। লোকটা আমারই সৎ-বাবা তো, তাই আমি জানি, ও কখন কী করে না করে। তবু ওই ঘরের উষ্ণতা ছেড়ে যে তুমি আমার ডাকে মাথার ওপরে জ্যাকেটের হুড তুলে দিয়ে বেরিয়ে এলে, তারপরেও তোমাকে ভালোবাসব না?

কী বলছ? কেন ডেকেছিলাম? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ডেকেছিলাম তোমাকে কয়েকটা জিনিস দেখাবার জন্যে। দেখো, এখনও চাঁদ ওঠেনি। তবু তারা... শুধু কোটি-কোটি তারার নীল-আলোয় কী আশ্চর্যভাবে আলোকিত হয়ে আছে চরাচর। একবার চারিদিকে তাকাও। মনে হচ্ছে না, আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা তুষারশৃঙ্গগুলো যেন ভঙ্গুর ব্লু-পটারির পরত দিয়ে বানানো? যেন টোকা মারলেই ঝনঝন করে ভেঙে পড়বে! আজকেই দিনের আলোয় যে রুপোলি রঙের ঋষিশৃঙ্গ, হরদেওল, সাঙ্গাবাং আর নন্দাদেবীকে দেখেছিলে, এখন তাদের কাউকে চিনতে পারছ ড্যানিয়েল?

শোনো না ড্যানিয়েল! আরও বড়ো একটা কারণ রয়েছে তোমাকে বাইরে বের করার। ড্যানিয়েল, চলো না, আমরা দুজনে একটু ওইদিকে হেঁটে আসি। ওই যেখানে ইয়াক চলার পথের বাঁকে স্টান্টেড রডোডেনড্রনের ঝোপটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই ঠান্ডার মধ্যে খামোখা হাঁটতে যাবে কেন? আচ্ছা, প্রেমিকাকে এরকম প্রশ্ন কোনো পুরুষমানুষ করে? তুমি কি আমাকে একটুও ভালোবাসো না? তবু দাঁড়াও, দেখি যদি কোনো কারণ খুঁজে বার করতে পারি। দেখো ড্যানিয়েল, তোমার কি মনে হচ্ছে না, ওইখানে... ওই ঝোপটার ঠিক ওপাশ থেকেই ছায়াপথের শুরু? মনে হচ্ছে না, ঝোপটাকে বেড় দিয়ে ওপাশে গেলেই আমরা মিল্কিওয়ের বুকে পা দিয়ে ফেলব? তারপর আমরা দুজনে যদি ওই ছায়াপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সপ্তর্ষির পাশ দিয়ে, লুব্ধকের আগুনে হাত সেঁকে নিয়ে, আরও দূর মিথুনরাশির দিকে চলে যাই?

ইজ ইট নট রিজন এনাফ ফর টেকিং আ স্ট্রোল?

এসো ড্যানিয়েল, মাই ইয়াং লাভার! তোমার ওই ওকগাছের ডালের মতন শক্ত হাতে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরো। চলো, ঘুরে আসি।

।। দুই ।।

এই মিথিলানাথ! এই বাস্টার্ড, সান অফ আ বিচ মিথিলা! এদিকে শোন।

মিথিলানাথ পরিত্যক্ত কামারশালার লাগোয়া ছোটো ঘরটায় বসে মন দিয়ে একটা পালক-সমেত দেশি মুরগিকে আগুনে ঝলসাচ্ছিল। টেনে ছাড়ানোর বদলে এইভাবে পালকগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে চামড়ার নীচের চর্বির লেয়ারটা ঠিকঠাক থেকে যায়, মাংসের টেস্ট হয় খোলতাই। ড্যানিয়েলসাহেবের হুংকার শুনে সে মুরগিটাকে মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে পড়িমড়ি করে দৌড়ে সাহেবের ঘরের দরজায় হাজির হল।

সাহেবের ঘর নয়, ঘরটা এই ভুনাগিরি গ্রামের একমাত্র কামার গোপীনাথ রাওয়াতের। নভেম্বর মাসের শুরুতে বরফ পড়া শুরু হতেই ভুনাগিরি গ্রামের আর সব বাসিন্দার মতন গোপীনাথও নীচে নেমে গেছে। যোশিমঠ কিংবা আউলিতে মার্চ অবধি কাটিয়ে ওরা সবাই আবার ফিরে

আসবে নিজের গ্রামে। শুধু মানুষজনই নয়, গ্রামের কুকুর থেকে ঠাকুর অবধি সবাই নীচে নেমে গেছে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিসুনজির কাঠের মন্দির। বিসুনজিও নভেম্বর থেকে মার্চ অবধি যোশিমঠে অধিষ্ঠান করেন।

ভুনাগিরির জনশূন্যতার সুযোগ নিয়ে চোরের মতন গ্রামে ঢুকে পড়েছে মিথিলানাথ আর তার সৎ-মেয়ে ঘুঙরু। গত তিনবছর ধরে শীতকালে যখনই লুকিয়ে-চুরিয়ে ভুনাগিরিতে ঢোকে, তখনই মিথিলানাথ কামারশালার এই ঘরটায় ডেরা বাঁধে, কারণ, ঘরটা এমনিতেই হাপরের আগুনের ঝুলকালিতে এমন নোংরা হয়ে থাকে যে, আলাদা করে দু-তিনটে মানুষের বসবাসের চিহ্ন ঘরের মালিকের পক্ষেও খুঁজে বার করা অসম্ভব। এই সাবধানতাটুকু মিথিলানাথকে নিতেই হয়। সে জানে, ভুনাগিরির সাবেক বাসিন্দারা যদি তার চৌর্যবৃত্তির কথা বুঝতে পারে তাহলে শীতকালেও গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে অন্তত একজনকে গ্রামপাহারায় রেখে যাবে আর তখন তার ধান্দাপানি চৌপাট হয়ে যাবে।

সে যাই হোক, আপাতত ড্যানিয়েলসাহেবের খিস্তির তোড়ের মধ্যে থেকে মিথিলানাথ সারবস্তু যেটুকু উদ্ধার করতে পারল তাতে বুঝল, ঘুঙরুই আবার সমস্যা তৈরি করেছে। মেয়েটা এই ষোল-বছর বয়সেই ব্যাপক সুন্দরী, গাড়োয়ালি মেয়েরা যেরকম হয়। কিন্তু ইদানীং ও কীরকম যেন আধপাগলা মতন হয়ে গেছে।

ওই ঘুঙরুই নাকি একটু আগেই ড্যানিয়েলের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বিড়বিড় করে কীসব বলছিল আর তার মধ্যেই নাকি ঘরটা কাঠের আগুনে যেটুকু গরম হয়েছিল তার পুরো ওমটাই উবে গেছে। এখন কাঁপুনি লাগছে ড্যানিয়েলসাহেবের।

ড্যানিয়েল সবটা বর্ণনা করে শেষকালে মন্তব্য করল, ভগবান ক্ষমতা দিয়েও কেড়ে নিয়েছেন। না হলে তোর ওই সৎ-মেয়েকে ঘেঁটি ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে এক্ষুনি রেপ করতাম।

মিথিলানাথ তড়িঘড়ি ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, যাতে আর নতুন করে হিম-হাওয়ার ঝাপটা ভেতরে না ঢোকে। তারপর সাহেবের খালি গ্লাসে অ্যাপ্রিকটের মদ ঢেলে দিতে দিতে বলল, করবেন সাহেব, করবেন। ওটা তো প্যাকেজের মধ্যেই পড়ে।

কোনটা? সাহেব ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

ওই রেপটা। আমার খদ্দেররা সকলেই মেয়েটাকে ফাকিং করে। আপনি না হয় আজকেই নামর্দি-র পেশেন্ট, সাহেব। কিন্তু চিরকাল তো এরকম ছিলেন না। তখন নিশ্চয়ই অনেক বাচ্চা মেয়েকে ফাক করেছেন। কিন্তু আপনাকে বলছি সাহেব, এই বরফে ঢাকা নির্জন ভ্যালিতে শুয়ে ঘুঙরুকে রেপ করার মজাই আলাদা। এত জোরে চিল্লায়... এত জোরে চিল্লায় মেয়েটা যে, ভয়ের চোটে ধৌলিগঙ্গার রিভারবেডের রেসিডেন্ট নেকড়ে বাঘগুলো অবধি ডাকতে ভুলে যায়। সেই চিৎকারের ধাক্কায় সাঙ্গাবাং-এর চুড়ো থেকে গুমগুম শব্দ করে আভালাঙ্গ নেমে আসে। কিন্তু যেখান থেকে সবচেয়ে কাছের লোকালয়টাই কুড়ি-কিলোমিটার দূরে, সেখানে চিৎকার করে কী হবে?

মিথিলার কথা শুনতে শুনতে খেঁকুরে মর্কট ড্যানিয়েলের ঘোলাটে চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোঁ করে এক ঢোকে অনেকটা 'আরু' গলায় চালান করে দিয়ে তিনি মিথিলানাথের হাতটা চেপে ধরলেন। ধরা গলায় বললেন, পারব রে মিথিলা? আর কোনোদিন কোনো মেয়ের সঙ্গে সংগম করতে পারব?

কোনোদিন কী বলছেন সাহেব? কাল সকালেই আপনাকে নিয়ে আমি পানিখারু বুগিয়ালে যাব। 'বুগিয়াল' মানে চারণভূমি সাহেব - যেখানে গরমের দিনে আমাদের ইয়াক, ঘোড়া আর ভেড়াগুলো চরে ঘাস খায়। এখন অবশ্য পুরো বুগিয়ালটাই পুরু বরফের চাঁদরে ঢাকা। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আমার জানা আছে কোথায় মাটির তলায় লুকিয়ে রয়েছে কিড়া-জড়ি। সেই কিড়া-জড়ি খুঁড়ে বার করে আপনাকে খাওয়াব। মুহূর্তের মধ্যে আপনার রগে-রগে, পেশিতে পেশিতে ফুটন্ত টোম্যাটো-স্যুপের মতন গরম রক্ত ছুটবে। আপনার মনে হবে আপনি মানুষ নন, একটা হিট খাওয়া ঘোড়া। নিজের যন্তর দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাবেন সাহেব। গ্যারান্টি।

তারপর? —কামাতুর কিন্তু ইমপোটেন্ট ড্যানিয়েলসাহেবের গলাটা লোভে ঘড়ঘড়ে শোনালো।

তারপর আর কী সাহেব? পিস্টন ঠিক মতন কাজ করছে সেটা বুঝবার জন্যে গিয়ারবক্স তো চাই। ঢকাঢাঁই ঢকাঢাঁই ঘুঙরুর গিয়ারবক্সের মধ্যে আপনার পিস্টন চলবে। তারপর আপনি স্যাটিসফায়েড হলে আমাকে পয়সা দেবেন।

আধবুড়ো আমেরিকানটার মুখের দিকে তাকিয়ে মিথিলানাথ দেখল ওঁর ভুরুদুটো কুঁচকে গেছে। সে তাড়াহুড়ো করে বলল, না সাহেব, চিন্তা করবেন না। শুধু কিড়া-জড়ির দাম নেব। ঘুঙরুর দাম ধরব না। ওর মাকে শ[illegible] করেছিলাম কি এমনি এমনি নাকি? ঘুঙরু আমার সম্পত্তি। যতদিন [illegible]বে আমার কাস্টমারদের জন্যে ফ্রি-সার্ভিস দেবে হারামজাদি।

জানেন সাহেব, ওর মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন কি কষ্টে ছিলাম। মেয়েছেলেটা কিড়া-জড়ি বিক্রি করে পাওয়া লাখ-লাখ টাকার মধ্যে একটা টাকাও কোনোদিন আমার হাতে তুলে দেয়নি। ওই মেয়েকে, ওই ঘুঙরুকে, দুন-স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে পড়াত ওর মা। ক্লাস নাইন অবধি পড়ে ফেলেছিল মেয়েটা। ভাগ্যিস সেইসময়েই আমার বউ মরে গেল! তবে একটু সুখের মুখ দেখলাম।

লাখ-লাখ টাকা! আমেরিকার অস্ত্র-ব্যবসায়ী বুড়ো ঘুঘু রিচার্ড ড্যানিয়েল মিথিলার কথার মধ্যে থেকে ঠিক জায়গাটা ছেঁকে নিল। কী করলি সেই লাখ-লাখ টাকা?

ইয়ে... মাথা চুলোকোল মিথিলা। তারপর হঠাৎ কোত্থেকে যেন সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলল, হৃষীকেশের রেন্ডিগুলোর পেছনে উড়িয়ে দিয়েছি সাহেব।

তারপর? কিড়া-জড়ি তোলার সিজনে আবার কামাতে পারতিস তো!

না সাহেব। হাহাকার করে উঠল মিথিলা। এ শালা গাঁওবালোদের আজীবসি কানুন রয়েছে। ভুনাগিরি গ্রামের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর অন্য কেউ এই এলাকার কিড়া-জড়িতে হাত দিলে ওরা তার হাত কেটে ফেলবে। আমি তো এই গ্রামের অরিজিনাল বাসিন্দা নই সাহেব। আমার গ্রাম আরও অনেটা নীচে – পালিয়ানা তার নাম। এমনকি ঘুঙরুকেও ওরা এই ভুনাগিরি গ্রামের মেয়ে বলে ধরে না। ওর বাবাও ছিল যোশিমঠের লোক।

সেইজন্যে অফ-সিজনে চুরি করে গ্রামে ঢুকিস?

ইয়েস সাহেব। গ্রামে ঢুকি আর ভারতের বাজারে যে কিড়া-জড়ির দাম পার কেজি একলাখ বিশহাজার টাকা, চায়নার বাজারে মিনিমাম পনেরো লাখ, পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে দামি ফাঙ্গাস যে কিড়া-জড়ি, সেই কিড়া-জড়ি আমি দশহাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি করে দিই। ধরা পড়লে খুন হয়ে যাব জানি। কিন্তু কী করব সাহেব? পেটের দায় বড়ো দায়।

পেটের না পেটের নীচের? নিজেও রেগুলার কিড়া-জড়ি খাস, তাই না? চোখ মেরে জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড ড্যানিয়েল। তারপর দুজনেই একসঙ্গে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন।

।। তিন ।।

মিথিলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে হয়তো ক্রমশ জাঁকিয়ে বসা মদের নেশাতেই ড্যানিয়েলের মাথায় কিড়া-জড়ি কথাটা আরও জাঁকিয়ে বসল।

ড্যানিয়েলের বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। কী হবে কোটি ডলার কামিয়ে, কী হবে গাড়ি ভিলা ইয়াট নিয়ে, যদি সুখের সেরা সুখটাই বেহাত হয়ে যায়? বয়স তার কত? মাত্র পঞ্চান্ন। তবু এত তাড়াতাড়ি কেমন করে যে পুরুষাঙ্গ উত্থানরহিত হয়ে গেল, তা তিনি ভেবে পান না।

গত তিনবছরে নানাভাবে চেষ্টা করেছেন হারানো পৌরুষ ফিরে পেতে। অ্যালোপ্যাথি দিয়েই শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে বাদ সেধেছে দুর্বল হৃদযন্ত্র আর উচু-তারে বাঁধা রক্তচাপ। ওঁর ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান ডাক্তার হিসেবে একনম্বর এবং সেই কারণেই স্পষ্টবাদী। একদিন পরিষ্কার বলে দিলেন, ভায়াগ্রা খেয়ে হার্ট অ্যাটাক হলে আমি বাঁচাতে আসব না।

তখন পড়ে রইল প্যারালাল মেডিসিন। তারও অভাব নেই আমেরিকার বাজারে। সাউথ আমেরিকা থেকে দলে-দলে বাচ্চা মেয়েদের স্মাগল করে ইউনাইটেড স্টেটসে ঢোকায় যে পিম্পগুলো, তারাই পেটকোঁচড়ে লুকিয়ে নিয়ে আসে অ্যামাজন বেসিনের বুনো ফল, লতাপাতা, এমনকি পোকার রস অবধি। ব্যবহার করে দেখেছেন ড্যানিয়েল – ফালতু, সব ফালতু।

তারপর একদিন এই অস্ত্র বিক্রির লাইনেরই একজন অভিজ্ঞ বন্ধু বললেন, পারলে একবার ইন্ডিয়ায় ঘুরে এসো। দা ল্যান্ড অফ কামাসূত্রা। হিমালয়ের বুকে এখনও এমন সব জড়িবুটি মেলে যাদের কাজ দেখলে মনে হবে ম্যাজিক।

একাই ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিলেন রিচার্ড ড্যানিয়েল। এসব কাজে লোক জানাজানি করার কোনো মানে হয় না। অবশ্য ওঁর ট্র্যাভেল-এজেন্ট থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

পাঁচদিন আগে দিল্লি থেকে হরিদ্বার পৌঁছিয়ে ওখানকার বড়াবাজারে ঘুরছিলেন। জায়গাটাকে খুব প্রমিজিং মনে হচ্ছিল। লাইন দিয়ে জড়িবুটির দোকান। দোকানিগুলো ভারি চালাকচতুর। ড্যানিয়েলসাহেবের মুখ দেখেই বুঝে নিচ্ছিল কী চাই। বলছিল – অ্যাফ্রোডিসিয়াক চাইছেন তো সাহেব? এই নিন শিলাজতু – পাথরের ঘাম। এই নিন অশ্বগন্ধা। জিংসেং নেবেন? অরিজিনাল চাইনিজ জিংসেং?

পেছন-পেছন অনেকক্ষণ থেকেই ঘুরছিল রোগামতন বছর পঞ্চাশের একটা পাহাড়ি লোক। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে ড্যানিয়েলের কানে-কানে বলল, ওসব কিছু নয় সাহেব। গরিব লোকের ওষুধ। পাঁচশো কী হাজার টাকা কেজি। আপনার খরচা করার ক্ষমতা রয়েছে। সেই জিনিসের পেছনে খরচা করুন, আরব শেখেরা যে-জিনিসের ইস্তেমাল করে।

লোকটার চোখেমুখে এমন একটা প্রত্যয় ছিল যে, ড্যানিয়েল তাঁর ট্র্যাভেল-এজেন্টের সমস্ত সাবধানবাণী ভুলে ওর সঙ্গে কথোপকথনে জড়িয়ে পড়লেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস করলেন, জিনিসটা কী?

এদিকে আসুন!

লোকটা একটা অন্ধকার কানাগলির মধ্যে রিচার্ড ড্যানিয়েলকে টেনে ঢুকিয়ে নিল। তারপর পোশাকের ভাঁজের নীচে লুকোনো কোনো পকেট থেকে খুব দ্রুত একটা খবরের কাগজের মোড়ক বার করে বিদ্যুতগতিতে সেটাকে একবার খুলে আবার মুড়ে রেখে দিল পকেটে। ড্যানিয়েল এক-সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেলেন ইজিপসিয়ান মমির শুকিয়ে যাওয়া আঙুলের মতন একটা জিনিস, যার নখের কাছ থেকে বেরিয়ে আছে শুকনো ব্যাঙের ছাতার মতন একটা ফাঙ্গাস।

ভালো করে দেখতে পেলাম না তো! তিনি অনুযোগ করলেন।

এর বেশি দেখাতে পারব না। আর কেউ দেখে ফেললে খুন হয়ে যাব। আপনি বরং ওখানে দেখে নিন। লোকটা চোখ দিয়ে ইশারা করল ড্যানিয়েলের হাতে ধরে থাকা ট্যাবটার দিকে। বলল, গুগলে গিয়ে টাইপ করুন – কে, আই, আর, এ; জে, এ, আর, আই। কিড়া-জড়ি।

ড্যানিয়েল কেমন যেন হিপনোটাইজড হয়ে গিয়েছিলেন। লোকটার কথা শুনে ওই কানাগলিতে দাঁড়িয়েই ট্যাবের স্ক্রিনে আঙুল বুলিয়ে বার করে আনলেন কিড়া-জড়ির গাঁঞ-গোত্র-মেল।

লোকটা ছিল এই মিথিলানাথ বিস্ত।

কিড়া-জড়ির হাল-হকিকত তিনি ডাউনলোড করে রেখেছেন এখানে — রিচার্ড ড্যানিয়েল নিজের ট্যাবে ডাউনলোডেড আইটেমের ফাইল খুলে আবার পড়তে শুরু করলেন।

তিব্বত-মালভূমি আর হিমালয়ের এই ভুনাগিরির মতন বিশাল উচ্চতার উপত্যকাগুলোর পাথুরে-মাটির নিচে বাস করে এক জাতের মথের লার্ভা। দুনিয়া বরফে ছেয়ে গেলেও মাটির নীচে গরমে ওরা ভালোই থাকে। যখন বসন্ত আসে, বরফ গলে যায়, তখন ওই লার্ভাগুলো খোলস ছেড়ে পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়। মাটির ওপরে উঠে এসে মেটিং করে, ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে ওদের গুঁড়িগুঁড়ি শুককীট। ঢুকে যায় মাটির তলায়।

সব লার্ভাদের কপাল অবশ্য এত ভালো হয় না। ওদের মধ্যে কারুর কারুর শরীরে বাসা বাঁধে ওফিওকর্ডিসেপস সিনেনসিস – একজাতের পরজীবী ফাঙ্গাস। সেই লার্ভাগুলো 'জোম্বি' হয়ে যায় — জ্যান্ত মড়া। ইনফেক্টেড লার্ভাগুলো মাটির নীচ থেকে সার্ফেসের কাছাকাছি উঠে আসে। নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে যতদিন না ফাঙ্গাসের চারা তার ভেতরের রক্তমাংস চুষে শেষ করছে। তারপর পূর্ণাঙ্গ ফাঙ্গাসটা মাটি ফুঁড়ে ওপরে মাথা বাড়ায়। তখনও কিন্তু শুকনো লার্ভা-টা ফাঙ্গাসের শেকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সবমিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অর্ধেক পোকা আর অর্ধেক গাছের মিলিত রূপ।

ওই ফাঙ্গাসে লার্ভায় জড়ানো-মড়ানো জিনিসটার নাম কিড়া-জড়ি। কিড়া মানে পোকা আর জড়ি হচ্ছে হার্বাল মেডিসিন। কিড়া-জড়ি হচ্ছে এই দুনিয়ার সবচেয়ে দামি ফাঙ্গাস। কারণ নষ্ট যৌনক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে কিড়া-জড়ির জুড়ি নেই।

পরের দিনই ড্যানিয়েল মিথিলানাথের সঙ্গে রওনা দিয়েছিলেন ভুনাগিরির পথে। যোশিমঠ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার গাড়িতে আসা গিয়েছিল। সেই জায়গাটার নাম ছিল রুইং। রুইং-এর উচ্চতা ছিল আটহাজার ফিট। সেখান থেকে পরের দুদিনে আরও দুহাজার ফিট চড়াই ভেঙে আজ দুপুরেই ভুনাগিরিতে পৌঁছেছেন রিচার্ড ড্যানিয়েল। এবং এখানে পা দিয়েই বুঝেছেন, রুম-হিটার কিংবা সেন্ট্রাল হিটিং-এর উষ্ণতা ছেড়ে

তিনি এই বরফান-মুলুকে আসতেই পারতেন না, যদি না মিথিলানাথের মুখে সারাক্ষণ অন্যতর এক উষ্ণতা ফিরে পাওয়ার আশ্বাস পেতেন।

কটা বাজল? ট্যাবটাকে শাট-ডাউন করে রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন ড্যানিয়েল। সবে সোয়া সাতটা। অথচ মনে হচ্ছে কতই যেন রাত। এবার মিথিলানাথ খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে দিলেই তো পারে। কাল আবার আলো ফুটলেই ওর সঙ্গে কিড়া-জড়ির খোঁজে বেরোতে হবে।

খালি গ্লাসটা মেঝের ওপরে নামিয়ে রেখে তিননম্বর জ্যাকেটটা গায়ে চাপালেন ড্যানিয়েল। তারপর নিজের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে কামারশালার পেছনে ছোটোঘরটাকে লক্ষ করে হাঁটা লাগালেন। ওই ঘরেই রান্নার কাজ করছে মিথিলানাথ। দুপুরে লাঞ্চও সেরেছেন ওই ঘরেই।

ঘরের বাইরে পা দিয়েই কেঁপে উঠলেন ড্যানিয়েল। সেটা শুধু ঠান্ডার জন্যে নয়। সাঙ্গাবাং-এর যমজ-চূড়ার মাঝখান দিয়ে সবেমাত্র পচা কমলালেবুর মতন একটা চাঁদ মুখ বাড়িয়েছে। ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে এই ছোট্ট উপত্যকাটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মহাপর্বতগুলো যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে... এগিয়ে আসছে... ভুনাগিরি গ্রামটাকে পায়ের নীচে থেঁতলে মারার জন্যে।

আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে, রিচার্ড ড্যানিয়েল একরকম দৌড়েই মাঝের পাথুরে জমিটুকু পেরিয়ে মিথিলানাথের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

।। চার ।।

ড্যানিয়েল, প্রিয়তম আমার। তুমি এর আগে আর কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছ? আমি তোমার কাছে লুকোব না... আমি না এর আগে অনেক অনেক পুরুষকে ভালোবেসেছি।

তার মধ্যে আমার সৎবাবা মিথিলানাথ বিস্তও রয়েছে।

তুমি নিজে তো পুরুষ। পুরুষদের ভালোবাসা কেমন হয় তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। পুরুষের ভালোবাসা পেলে দুই উরুর মাঝখানে যন্ত্রণা হয় খুব। ছিঁড়েখুঁড়ে যায় ভেতরের শিরা-উপশিরা। রক্তপাত হয়। পুরুষদের

ভালোবাসাকে রেসিপ্রোকেট করতে হয় চিৎকার দিয়ে... চিৎকার। এমন চিৎকার যাতে যোনির মতন গলা চিরেও রক্ত বেরিয়ে আসে।

তোমার হিংসে হচ্ছে না তো ড্যানিয়েল, আমার কথা শুনে? হিংসে কোরো না। আমি জানি, কাল সকালে মিথিলানাথ তোমাকে নিয়ে কিড়া-জড়ি তুলে আনতে যাবে। তার মানে কাল সন্ধেবেলার মধ্যেই তুমি আমাকে ভালোবাসার সুযোগ পাবে। এইটুকু অপেক্ষা নিশ্চয়ই তুমি করতে পারবে ড্যানিয়েল?

জানো ড্যানিয়েল। অনেকদিন আগে আমি ভালোবাসা মানে অন্য কী যেন বুঝতাম। হয়তো স্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়া জেন অস্টেনের কোনো নভেল থেকে কিংবা দেরাদুনের ছোট্ট সিনেমাহলটায় বান্ধবীদের সঙ্গে লুকিয়ে-দেখা কোনো সিনেমার প্রেমদৃশ্য থেকে ওরকম ভুল ধারণা হয়েছিল আমার। যাই হোক, সেসব এখন মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন আমি বরং এই নতুন রকমের প্রেমের প্রতীক্ষায় থাকি। বাবা যে-কাস্টমারকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আমি তার প্রেমে পড়ে যাই। আমি তো জানি, আমি সুন্দরী, মোহময়ী। আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা কোনো পুরুষের নেই। আমি তো জানি, আমার নতুন-প্রেমিক প্রথমে বাবার সঙ্গে কিড়া-জড়ি খুঁজতে বেরোবে। তারপর আমার সঙ্গে প্রবল চিৎকারময় এক প্রেমের খেলায় মেতে উঠবে। কী মিষ্টি জীবন আমার, তাই না ড্যানিয়েল?

এই দেখো। আবার তুমি মনখারাপ করছ? তুমি মনখারাপ করলে আমি ঠিক বুঝতে পারি। আচ্ছা, আমার সেই প্রাক্তন প্রেমিকদের নাম জেনে তোমার কী লাভ বলো তো? আর সত্যি কথা বলতে কী, তাদের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। কোনো প্রেমিকের নামই আমি দুদিনের বেশি মনে রাখতে পারি না। অথচ যতক্ষণ কাছে থাকে, তাদের নাম আমি মন্ত্রের মতন জপ করি।

অনেক কিছুই আজকাল মনে রাখতে পারি না। মাথার ভেতরটা সারাক্ষণ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে থাকে। উরুর ফাঁকে আর ঘাড়ে বিষাক্ত একধরনের ঘা ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা তো গরমকালে ভুনাগিরি ছেড়ে নীচে পালাই। কারণ তখন মিথিলানাথকে এখানে দেখলে এই গ্রামের লোকেরা কেটে দু-টুকরো করে ফেলবে। তা, গতবছর গরমকালে ওরকম নীচে থাকার সময় এক

ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল মিথিলানাথ। ডাক্তারবাবু তো ভয়ংকর রেগে গেলেন মিথিলানাথের ওপরে। বললেন, এইটুকু একটা মেয়ের সিফিলিস ধরে গেল, আর তুমি বাপ হয়ে বুঝতে পারলে না?

সেদিন বাবা অবিকল একটা তাড়া খাওয়া কুত্তার মতন মুখ নীচু করে ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

ওই ডাক্তারবাবু কিন্তু তখনই বলেছিলেন, এই ঘা-গুলোর জন্যে আমার মাথাটাও আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাবে।

ওঃ, বিসুনজি বিসুনজি! তুমি আমাকে ক্ষমা করো ঠাকুর। নতুন প্রেমিক, যুবক প্রেমিকের সামনে আমি রোগের সাতকাহন খুলে বসেছি। আমি কি আর কোনোদিন বড়ো হব না? না ড্যানিয়েল। তুমি বিদেশি মানুষ। তোমাকে আমি বরং খোয়াটোলির গল্প বলি। তোমার শুনতে ভালো লাগবে।

'টোলি' মানে ঘোড়ার পাল কিংবা ভেড়ার পাল। মোটকথা যে কোনো রকমের পালতু-জানোয়ারের পালকেই আমরা 'টোলি' বলি। এই ভুনাগিরি থেকে হরদেওলের দিকে যদি তুমি হেঁটে যাও, তাহলে মাঝপথে তোমাকে প্রায় দেড়হাজার ফিট উতরাই নেমে যেতে হবে। ওই উতরাইয়ের শেষে পাইনবনের মধ্যে একটা লুকোনো বুগিয়াল রয়েছে। সবুজ ঘাসে মোড়া বুগিয়াল, কিন্তু এদিকের কোনো মানুষ ওই বুগিয়ালে গোরু-ভেড়া চরাতে নিয়ে যায় না। ওই বুগিয়ালে একবার একপাল ঘোড়া বরফের ধসের নীচে চাপা পড়ে মরে গিয়েছিল। এবার বুঝলে তো, কেন জায়গাটার নাম 'খোয়াটোলি'?

ঘোড়াগুলো কিন্তু পুরোপুরি খোয়া যায়নি। ওরা এরকম জ্যোৎস্নারাতে ওই খোয়াটোলির বুগিয়ালে ফিরে আসে। তাদের কুয়াশার মতন শরীর। জোনাকির মতন চোখ। আমি মাঝেমাঝে খোয়াটোলির বুগিয়ালে গিয়ে বসে থাকি। আমি দেখি সাদা ঘোড়ার পাল মুখ নামিয়ে ঘাস খাচ্ছে। পাইনগাছের ডালে তাদের হালকা সবুজ কেশরের টুকরো আটকে থাকে। একদিন সেই কেশরের টুকরো আমি বুকের মাঝখানে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। কেমন করে জানব সেদিনই রাত্তিরে বাবা আমাকে ভালোবাসতে আসবে আর হাতেনাতে ধরে ফেলবে আমার কীর্তি? ভগবান বাঁচিয়েছিলেন সেদিন আমাকে। মিথিলানাথ ওগুলোকে ঘোড়ার কেশর বলে বুঝতেই পারেনি। উলটে আমাকে জিজ্ঞেস করল – বুকের

মধ্যে মসের শেকড় লুকিয়ে রেখেছিস কেন রে রেন্ডিকে বেটি? আমি কোনো উত্তর দিইনি।

আর একটা গল্প শুনবে? এটাও মিথিলানাথের বোকা বনার গল্প। শুনলে তুমি মজা পাবে।

তুমি যদি ভুনাগিরি থেকে নিতি পাসের দিকে যাও তাহলে একটা অদ্ভুত গাছ দেখতে পাবে। দেখলেই বুঝতে পারবে ওটা সত্যিকারের গাছ নয়, এক শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। কী যে রূপ সেই গাছের, দেখলে হিংসে হয় আবার ভালোও লাগে। মসৃণ উরুর মতন দ্বিধাবিভক্ত কাণ্ড। বাকল তো নয়, যেন মিশরের রানির গাধার দুধ দিয়ে ধোয়া ত্বক – তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই ধবল। ঠিক যেখানে অপ্সরার স্তন থাকার কথা সেখানে কাণ্ডের ওপরে স্তনের মতনই দুটি উদ্ভেদ। যেখানে যোনি থাকার কথা সেখানে একটা লম্বালম্বি চিড়।

বাবার কাস্টমার না থাকলে আমি মাঝেমাঝে ওই গাছটার কাছে গিয়ে বসে থাকি। মনে হয় আমার বান্ধবীর পাশে বসে আছি।

তা কয়েকদিন আগে হঠাৎ দেখি, ওই গাছেরও যোনির পাশে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। ঘষা লেগে চামড়া উঠে গেলে যেরকম হয়, আমারও যেমন আছে।

আমার খুব মায়া হল। অপ্সরাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকেও কি তাহলে কেউ ভালোবেসেছে? আমার মতন?

অপ্সরা কোনো জবাব দিল না। তখন আমি সাতপাঁচ ভেবে ওর সেই ঘষালাগা চামড়ার টুকরো একটুখানি বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরলাম। ভাবলাম অপ্সরার তো পায়ের জায়গায় শেকড়, ও তো হাঁটতে পারে না। তাহলে ওই ছালটুকুই না হয় নিয়ে গিয়ে হরিদ্বারের ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে দাওয়াই চাইব। বিশ্বাস করবে না ড্যানিয়েল, সেদিনই আবার মিথিলানাথের আমাকে ভালোবাসার দরকার পড়ল আর মিথিলানাথ যথারীতি আমার বুকের ভাঁজ থেকে ওই চামড়ার টুকরোটা বার করে ফেলল। আমি তো ভগবানকে ডাকছি। ও যদি জানতে পারে আমি সেই রাগি ডাক্তারবাবুর কাছে যাবার কথা ভাবছি, তাহলে তো আর আমাকে ভালোবাসবে না। কিন্তু ভগবান আছেন। মিথিলানাথ এবারেও চামড়ার টুকরোকে চামড়ার টুকরো বলে চিনতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, এ কী রে রেন্ডিকে বেটি। বুকের মধ্যে ভূর্জ গাছের ছাল নিয়ে

ঘুরছিস কেন? মাথাটা কি তোর একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে?

কী বলছ? ওই ছালটা আমার কাছে আছে কিনা। কী করবে ডার্লিং? ও, তুমিই ওটা নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে? আছে বই কি। চলো, আমি তোমার ব্যাগে ওটা রেখে দিয়ে আসছি।

।। পাঁচ ।।

জানলাহীন কাঠের ঘরে বেলা বোঝা যায় না। ঘুম ভাঙার পরে ড্যানিয়েল রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। দশটা বাজে। এত বেলা হয়ে গেছে! মিথিলানাথ তাকে ডেকে দেয়নি কেন? ওর তো ড্যানিয়েলকে নিয়ে সকাল সাতটার মধ্যে কিড়া-জড়ি খুঁজতে বেরোনোর কথা।

গরম পোশাক গায়ে চাপিয়ে ড্যানিয়েল দরজা খুলে বাইরে বেরোল। তীব্র নীল আকাশ। তুষারশৃঙ্গের মাথা থেকে চোখ-ধাঁধানো আলো ঠিকরোচ্ছে। এই শীতে পশুপাখি সবই প্রায় লোয়ার অলটিচ্যুডে নেমে গেছে। শুধু কটা দাঁড়কাকের মতন দেখতে রাভেন, মিথিলানাথের রান্নাঘরের পেছনদিক থেকে যে রাস্তাটা নীচে নেমে গেছে, সেই রাস্তার ওপরে বসে খুঁটে খুঁটে কী যেন খাচ্ছিল। ড্যানিয়েলকে এগিয়ে আসতে দেখে পাখিগুলো গুম্ফার ঘণ্টার মতন গম্ভীর ডাক ছেড়ে উড়ে গেল। ড্যানিয়েল দেখল ওই রাস্তায় সাদা বরফের ওপরে কালচে রক্তের বেশ মোটা পলেস্তারা। জমাট-বাঁধা রক্ত খাচ্ছিল রাভাইনগুলো।

কীসের রক্ত? মুরগির? তাই হবে।

কাল রাতে ঘুমোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল ড্যানিয়েলের। খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরের সামনে পৌঁছেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তার ঘরের দরজার পাল্লা দুটো হাট করে খোলা আর মেঝের ওপরে হাঁটু গেঁড়ে বসে তার রুকস্যাক হাতড়াচ্ছে ঘুঙরু।

দৃশ্যটা দেখে চড়াক করে মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল ড্যানিয়েলের। তিনি চিৎকার করে মিথিলানাথকে ডেকেছিলেন। মিথিলানাথ আসতে দেরি করেনি। তবে তারপরে যেটা করেছিল সেটা বাড়াবাড়ি। চুলের মুঠি ধরে মেয়েটাকে টানতে টানতে ওই রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর নিজের সৎ-মেয়েটাকে অনেকক্ষণ ধরে রেপ করেছিল শুয়োরের বাচ্চাটা।

সে কি চিৎকার মেয়েটার। ড্যানিয়েল যে জীবনে এই প্রথম কোনো রেপ ভিক্টিমের চিৎকার শুনলেন, তা নয়। তিনিও ওই চিৎকার সহ্য করতে না পেরে দুহাতে কান চেপে ধরে স্লিপিং-ব্যাগের মধ্যে কাঠ হয়ে শুয়ে ছিলেন। বাস্তবে সেইসব শব্দ থেমে যাওয়ার পরেও বহুক্ষণ ঘুঙরুর আর্তচিৎকারের প্রতিধ্বনি দেবভূমির পাহাড়ে-উপত্যকায় মাথা খুঁড়ে ঘুরে মরেছিল আর সেই জন্যেই ড্যানিয়েলের চোখে ঘুম আসতেও অত দেরি হয়েছিল।

আজ সকালে মিথিলানাথের রান্নাঘর-কাম-বেডরুমে ঢুকে ড্যানিয়েল দেখলেন, মিথিলা সেখানে নেই ঠিকই, কিন্তু ঘুঙরু বেশ খুশিখুশি মুখে কাঠের উনুনে কেটলি বসিয়ে জল গরম করছে। ড্যানিয়েল অবাক হয়ে ভাবলেন, এই মেয়েটাকেই কাল ওর স্টেপফাদার রেপ করেছে? এই মেয়েটাই গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল! কই, এখন ওর চোখেমুখে আতঙ্ক, ঘৃণা কিংবা যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই তো। ড্যানিয়েল মাথাটা দুদিকে ঝাঁকিয়ে ঘুমের ঘোর কাটাবার চেষ্টা করলেন।

নাস্তা বানাই সাহেব? ড্যানিয়েলের সামনে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে, ভারি লাস্যময়ী ভঙ্গিতে ঘুঙরু প্রশ্ন করল। ঘুঙরুর ক্ষতবিক্ষত দুই ঠোঁটের চাপা হাসির মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিকতা ছিল যার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় গতরাতের মরা জ্যোৎস্নার। ড্যানিয়েল আগের রাত্রে যেমন কেঁপে উঠেছিলেন, তেমনই কেঁপে উঠলেন আর একবার। তারপর বেশ চেষ্টা করে গলার জোর ফিরিয়ে এনে ঘুঙরুকে বললেন, নাস্তাফাস্তা পরে হবে। মিথিলানাথ কোথায় গেল? ওর যে আজ সাতটার সময় আমাকে নিয়ে বেরোনোর কথা ছিল।

ঘুঙরু ছোট্ট উত্তর দিল – ভেগেছে। তারপর একটা তারজালির ওপরে কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি চাপিয়ে উনুনের আঁচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেঁকতে আরম্ভ করল।

ভেগেছে! কেন? কোথায়? আমার সঙ্গে তো ওর কোনো ঝামেলা হয়নি।

ঘুঙরু পাঁউরুটিটা তারজালির ওপর থেকে নামিয়ে কাঠের টেবিলের ওপরে রেখে একটা চামচের হাতল দিয়ে সেটার ওপরে মাখন লাগাতে শুরু করেছিল। মুখ না তুলেই জবাব দিল – আপনি বুঝতে পারেননি, লোকটার মাথা খারাপ? না হলে কেউ ঘোড়ার কেশরকে মসের শেকড়

বলে? মেয়েমানুষের চামড়াকে কেউ বলে ভূর্জগাছের বাকল?

ষোলবছর বয়েস হলেও কনভেন্টে পড়া মেয়েটার ইংরিজি উচ্চারন তুখোড়। তবু ওর কথাগুলোর মানে ড্যানিয়েল পুরোপুরি বুঝতে পারলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, এখন আমার কী হবে?

কেন ঝুটমুট চিন্তা করছেন সাহেব? আমি তো আছি। আমি আপনাকে কিড়া-জড়ি খুঁজে দেব। তারপর আমিই আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে পৌঁছে দেবো রুইং গ্রামের বাসরাস্তায়।

ড্যানিয়েল চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ মেয়েটাকে ভালো করে মাপলেন। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘুঙরুর সামনের টেবলের ওপর। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, ছুরি নেই? রুটিটাকে আগে স্লাইস করে নিলি না কেন?

ঘুঙরু অসহায়ের মতন ঘরটার চারিদিকে তাকাল। তারপর লজ্জিতমুখে বলল, ছুরিটা সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না সাহেব।

চুলোয় যাক ছুরি। চুলোয় যাক ব্রেকফাস্ট। তুই এখন আমার সঙ্গে চল। যদি সত্যিই কিড়া-জড়ি খুঁজে দিতে পারিস তাহলে মিথিলাকে যা প্রমিজ করেছিলাম, তোকেও তাই দেব। পুরো দশ।

ঘুঙরু আর কথা না বাড়িয়ে খুলে-রাখা ট্রেকিং বুটজোড়া পায়ে গলিয়ে ফিতে বাঁধতে শুরু করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের কোনা থেকে একটা ছোটো শাবল তুলে নিয়ে বলল, সেই ভালো। চলুন আগে কাজটা সেরে আসি।

সেই রক্তজমা রাস্তাটা ধরেই ঘুঙরু হাঁটতে শুরু করল; পেছন পেছন রিচার্ড ড্যানিয়েল।

বড়োজোর দুশোমিটার গিয়েই রাস্তাটা শেষ হয়েছে একটা ছোটো নালার ধারে। মনে হয় ভুনাগিরি গ্রামের নিকাশি-জল ওই নালাটা ধরেই নীচের নদীতে গিয়ে পড়ে। নালাটার ধারে জমাট বরফের মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল একটা ছুঁচলো কালো পাথর। ঘুঙরু যেন ওই পাথরের চিহ্নটাই খুঁজছিল। খুঁজে পেয়েই ওটার কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসে, শাবল তুলে বরফের বুকে কোপ মারল।

ড্যানিয়েল ঠিক ঘুঙরুর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে অবাক গলায় বললেন, সে কী! মিথিলা যে আমাকে বলেছিল, সাত কিলোমিটার ট্রেক করতে হবে। তোদের গ্রামের ভেতরেই কিড়া-জড়ি পাওয়া যায় এমন কথা তো ও বলেনি!

শাবলের কোপ একবারও না থামিয়ে ঘুঙরু উত্তর দিল, কিড়া-জড়ি কখন যে কোথায় গজিয়ে ওঠে কে বলতে পারে সাহেব?

তারপরেই ঘুঙরু উঠে দাঁড়াল। বরফের গর্তটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দেখুন, কিড়া-জড়ি। যান নিজেই তুলে নিন।

ড্যানিয়েল জানতেন যেহেতু গোস্ট-মথের লার্ভারা কলোনি বেঁধে থাকে এবং কলোনি শুদ্ধুই প্যারাসাইট মাশরুমের খপ্পরে পড়ে – তাই কিড়া-জড়িও পাওয়া যায় একজায়গায় একগুচ্ছ। কিন্তু আপাতত তিনি বরফের গর্তের মধ্যে একটাই আঙুলের মতন বস্তু দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বরফের ওপর শুয়ে নীচের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর গর্তের মধ্যে তুলে আনলেন সেই সবেধন কিড়া-জড়ির টুকরো।

না, কিড়া-জড়ি নয়। একটা কর্তিত পুরুষাঙ্গ। ড্যানিয়েলের বমি পাচ্ছিল। তার হাতের আঙুল জড়িয়ে যাচ্ছিল চটচটে জমাট রক্ত, মানুষের রক্ত।

বিহ্বল মুখে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়েই ড্যানিয়েলের চোখে পড়ল ঠিক তার উলটোদিকে নালার মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মিথিলানাথের লাশ। তার দুই উরুর মাঝের অংশটা থেকে রক্ত বেরিয়ে বরফের ওপরে জমাট বেঁধে আছে, ঠিক যেমন জমাট বাঁধা রক্ত তিনি দেখেছেন রান্নাঘরের পেছনের রাস্তায়।

এবং ঠিক তখনই ড্যানিয়েলের পেছনদিক থেকে ঘুমপাড়ানি-গানের মতন ভেসে এল ঘুঙরুর চিকন গলার স্বর – এবার তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো ড্যানিয়েল? প্রিয়তম আমার! কিড়া-জড়ি মানেই তো ভালোবাসা। দেখো আমি তোমার জন্যে কেমন কিড়া-জড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

কিন্তু শুধু তোমার জন্যে ব্যবস্থা করলেই তো হবে না ড্যানিয়েল। দুদিন বাদে যখন তোমার নাম ভুলে যাবো, তখন যে নতুন প্রেমিক আসবে তার জন্যেও তো আমাকে কিড়া-জড়ির ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। মিথিলানাথ তো পালিয়েছে। আমি না করলে কে করবে বলো?

শাবলের চোট-টা যে মাথার পেছনদিকে পড়তে চলেছে সেটা ড্যানিয়েল বুঝতে পারেননি। কিন্তু ধারালো কিচেন-নাইফটা যখন তার মোটা কাপড়ের ট্রাউজার ব্রিচেস ইত্যাদি ফালাফালা করে দিয়ে লিঙ্গমূলে বসে যাচ্ছিল তখন তিনি একবার চিৎকার করার সময় পেয়েছিলেন।

ওই একবারই।

নোনা বালি চোরা টান



গুঞ্জাবালুতে পনেরোদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর নিশ্চিত হলাম, জায়গাটা পুরোপুরি ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে তৈরি নয়। সমুদ্রতীরের এই ছোটো শহরটার বেশ কিছু জিনিস অনুভব করা যায়, কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছানো যায় না কখনোই।

যেমন, আমি যে-বাড়িটায় রয়েছি – মহান্ত নিবাস – বেশ কয়েকবার দুপুরবেলায় সমুদ্র থেকে চান করে ফেরার সময়ে দেখেছি সেই বাড়ির দোতলায় একটা আধখানা চাঁদের মতন ঝুল-বারান্দা। সেই বারান্দায় রট-আয়রনের রেলিং আর সিলিং-এর হুক থেকে দড়িতে বাঁধা একটা টিয়াপাখির খাঁচা ঝুলছে।

বাইরে থেকে দেখতাম; কিন্তু আমি গত পনেরোদিনে অনেক চেষ্টা করেও মহান্ত নিবাসের অন্দর থেকে সেরকম কোনো বারান্দায় পৌঁছোতে পারিনি। এমন কিছু এলাহি প্রাসাদ তো নয়। অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি বেখাপ্পা বাড়িটার ফ্লোর তো মাত্র দুটোই। আমি পাগলের মতো এই সিঁড়ি থেকে ওই দালান, চিলেকোঠা থেকে পাম্পঘর – আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখেছি, নেই।

রট-আয়রনের রেলিং বসানো গোল-বারান্দা কোথাও নেই।

তবু এক-একদিন ভোরে একটা টিয়াপাখির আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে যেত। মনে হত, কেউ যেন খাঁচায় বন্দি পাখিটাকে বাইরে থেকে ধারালো শলা দিয়ে খোঁচাচ্ছে। আমি পারলে সেই জানোয়ারের কবজি মুচড়ে ধরতাম। কিন্তু জানতাম পারব না। বাড়ির মধ্যেই কোথাও ছিল সেই বারান্দা আর পাখির খাঁচা। কিংবা আসলে ছিল না, শুধু তাদের ছায়াটুকু ছিল। যেন ঘরের দেয়ালে ঝোলানো আয়নার কাচে অনেক দূরের কোনো চিলেকোঠার ছায়া। আমি হাজার চেষ্টা করলেও তাদের কাছে পৌঁছোতে পারতাম না।

ওদের কাছে পৌঁছোতে পারে শুধু যমন। বারো-বছরের ছেলেটা — যে মৃত্যুকে ইশারায় পথ দেখিয়ে ডেকে আনতে পারে।

গুঞ্জাবালু যেমন এক ছায়াশহর, যমনও তেমনি এক ছায়াকিশোর —যার শরীরের কিছুটা রক্তমাংস দিয়ে তৈরি আর কিছুটা পাতালের বিষবাষ্প।

আজ ভোরে, আমি আর থাকতে না পেরে মশারির বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে উঠলাম —যমন! কী করছ তুমি যমন? পাখিটাকে ওভাবে ঝাঁটার কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছ কেন?

যমনের গলা এখনও পুরুষের মতন ভারী হয়ে ওঠেনি। নারীর কণ্ঠস্বরের লঘুতা মিশে আছে। ও চেঁচিয়ে কথা বললে তাই মনে হয় একটা ব্রাহ্মণী-চিল যেন পায়ের নখে তিনসেরী এক কাতলাকে গেঁথে নিয়ে উড়াল দিল। সেইরকম গলাতেই ও কোথা থেকে যেন উত্তর দিল – খাঁচা কোথায় দেখলে? লিফট তো। লিফট-কে কি তুমি খাঁচা বলো? মানুষকে পাখি?

আমি হতাশ হয়ে আবার মশারির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুনেছিলাম টিয়াপাখিটা কেমন নিস্তেজ গলায় একবার... শেষবার ডেকে উঠেই হঠাৎ থেমে গেল।

একটু বেলা করে দ্বিতীয়বার যখন ঘুম থেকে জাগলাম, তখন শুনলাম, মহান্ত নিবাসের লাগোয়া যে হোটেলটা, হোটেল শশীকলা, সেখানে একটা বীভৎস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গ্রাউন্ডফ্লোরের মেঝের সঙ্গে গেঁথে-রাখা যে প্যাঁচানো লোহার স্প্রিংগুলোর ওপরে লিফট নেমে এসে দাঁড়ায়, সেরকমই একটা স্প্রিং কীসের টানে যেন কুণ্ডুলী ছেড়ে সোজা হয়ে গিয়েছিল। দিনের প্রথম লিফট পূর্ণগতিতে নেমে এসেছিল সেই লোহার ফালের ওপর। যিনি লিফটের ভেতরে ছিলেন, কিছু বোঝার আগেই তাঁর শরীরের কেন্দ্রস্থল ফুঁড়ে ঢুকে গেছে সেই ফাল।

গেলাম দেখতে। পাশের বাড়িই তো। ভিড়ের পেছন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, একজন গোলগাল মাঝবয়সি মহিলা — পরনে সস্তার সবুজ শিফন-শাড়ি, স্লিভলেস লাল ব্লাউজ। ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক। হোটেল শশীকলায় প্রতিরাতে যেসব লোকাল মেয়ে শরীর বেচতে আসে ইনি যে তাদেরই একজন সে-কথা বলে দিতে হয় না। শিকে গাঁথা অবস্থাতেই লিফটের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘাড়টা একদিকে হেলে

পড়েছে। ওনাকে দেখে খাঁচার ভেতরে মরা টিয়াপাখি ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবা সম্ভবই নয়।

বীভৎস দৃশ্যটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই দেখলাম, যমন ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে তাকাতে দেখে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, মানুষকে কি তুমি পাখি বলো?

তারপর যমন হোটেলের উঠোন পেরিয়ে তিরগতিতে ছুটে চলে গেল সমুদ্রের দিকে। তখনও জানতাম না, ও এক সমুদ্র-মানবীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে।

শুধু যমন কেন, আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় পুরো গুঞ্জাবালু শহরটাই সমুদ্রের গর্ভ থেকে উঠে এসেছে। তা না হলে, এর দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতেও কেন লেগে থাকবে সমুদ্রের আঁশটে গন্ধ, জমে থাকবে বালি? সমুদ্র থেকে দু-তিন কিলোমিটার দূরে নির্জন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসেও কেন উড়ন্ত নুনের গুঁড়োয় আমার চোখ জ্বালা করবে?

কেন স্টেশনের মালঘরের পেছনে রঘু নায়েকের মদের ঠেকে যাবার রাস্তায় পড়ে থাকবে মরা জেলিফিশ?

অবশ্য রঘু নায়েক সে-কথা শুনে বলল, কাগা-বগায় ঠোঁটে করে এনে ফেলেছে নিশ্চয়ই। ও নিয়ে ভাববেন না।

বলল ঠিকই, কিন্তু ওর নিজের গলাতেও বিশ্বাসের জোর ছিল না। কারণ, রঘু গুঞ্জাবালুর অরিজিনাল বাসিন্দা। ও আমার থেকে অনেক ভালো করে জানে যে, জেলিফিশকে কোনো পাখি কিংবা শেয়াল-কুকুর মুখে তোলে না। বিষের জন্যে।

রঘু নায়েকের ব্রুয়ারির কথা একবার মাথায় ঢুকে গেলে আর অন্য কোনো কথা ভাবতে ভালো লাগে না। গুঞ্জাবালুর অলীক অস্তিত্ব, যমনের মৃত্যু-আবাহন —সব তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। এত সুন্দর, এতই মোহময় সেই ব্রুয়ারি যে, আমি একমাত্র আমার প্রথম প্রেমের সঙ্গে তার তুলনা করতে পারি।

মালঘরের পেছনদিকে রেল-কোম্পানির লোহার বেড়ার ফাঁক গলে যে সরু পায়ে চলা রাস্তাটা রঘু নায়েকের চোলাইয়ের ঠেকের দিকে চলে গেছে তার দুপাশে পুঁটুশ আর অতসীর ঘন জঙ্গল। তুমি যতই সেই

নেশাঘরের দিকে এগোবে ততই চনমনে রোদে সেঁকাপোড়া পুটুশফুলের বুনো গন্ধ তোমাকে আবিষ্ট করে ফেলবে। তোমার কানে বাজবে শুকনো অতসীফলের ঝুমঝুমি। তুমি অবাক হয়ে দেখবে, রূপকথায় পড়া আঙুলপ্রমাণ জর্দাপরিদের কোমল যোনির মতন অজস্র বাসন্তীরঙের অতসীফুল। তাদের বড়ো পাপড়ির আড়ালে ছোটো পাপড়ি, তারও আবডালে তুলতুলে অঙ্কুর।

সবমিলিয়ে তুমি নেশা করার অনেক আগেই নেশার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

তুমি নেশাঘরের ভেতরে ঢুকে দেখবে সেটা আসলে একটা ইগলু —সেরকমই উপুড় করে রাখা গোল বাটির মতন তার ডিজাইন। শুধু বরফের চাঙড়ের বদলে ব্রিটিশ-আমলের ছোটো ইটে তৈরি তার দেয়াল আর ছাদ। ঘরটায় জানলা নেই, ঘুলঘুলি নেই। তাই দিনের বেলাতেও অনেক অন্ধকার জমে থাকে। দেখবে, ঘরটার ছাদ থেকে একটাই লণ্ঠন ঝুলছে এবং সেই লণ্ঠনটাও অনেকদিন আগের কোনো মালগাড়ির গার্ডসাহেবের ব্যবহার করা লণ্ঠন, যার সামনে পেছনে গোল আতশকাচ। ফলে ঘরটার দুদিকে আলো পড়ে, বাকি দুদিকে চির-অন্ধকার।

যে-দুদিকে আলো পড়ে তার মধ্যে একদিকে রঘু নায়েক মেঝেয় গর্ত খুঁড়ে বানানো উনুনে হাঁড়ির ওপরে হাঁড়ি চাপিয়ে কোনো গোপন বাখর, পচা চাল, চিটেগুড় আর নিশাদলের মিশ্রণে জ্বাল দিয়ে চোলাই বানায়। আলোকিত অন্য দেয়ালটায় সারি সারি বোতল – তাদের ভেতরে সবুজ, লাল, হলুদ ইত্যাদি নানান বিষাক্তরঙের আরক।

আর অন্ধকার দুইদিকে মেঝের ওপরে তালপাতার চাটাইয়ে বসে কাঁকড়ার ঝাল দিয়ে মদ খায় রঘু নায়েকের গ্রাহকেরা। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সমুদ্রের ধীবর। আমিও ওদের মধ্যেই বসি। ওদের মতোই তালপাতার দোনায় ঢেলে সদ্য হাঁড়ির মুখনল থেকে ধরে দেওয়া গরম মদ খাই। ওরা গত পনেরোদিনে আমাকে চিনে গেছে, মেনে নিয়েছে।

তবে জেলেরা নেশার জাল গুটিয়ে আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে ওদের সমুদ্রতীরের বস্তিতে ফিরে যায়, কারণ সূর্য ওঠার অনেক আগে ওদের আবার যার যার ক্যাটামারানে চেপে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার সেরকম কোনো তাড়া নেই বলে আমি বসে থাকি। রঘু উনুন থেকে মদের হাঁড়ি নামিয়ে ব্যঞ্জন চাপায়। শুঁটকিমাছ আর শুকনো লঙ্কার

প্রাচীন গন্ধে মনে হয় গুহাযুগে ফিরে গেছি। রঘু নায়েক আমার সঙ্গে গল্প শুরু করে।

অনেক গল্পের মধ্যে রঘু নায়েক মাঝেমাঝেই দেড়শো বছরের পুরনো এক পাপের গল্প বলে। অভিশাপের গল্প। সেটাই নাকি গুঞ্জাবালুর ভাগ্যের টার্নিং-পয়েন্ট।

সে বলে, অনেক বছর আগে এখানে, এই গুঞ্জাবালুতে, সমুদ্রের তীরে বারিধীনাথের বিশাল এক রেখদেউল দাঁড়িয়ে ছিল। তখন জেলেরা নির্ভয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত, কারণ যত দূরেই যাক, তারা চোখ রাখত সেই দিগন্তের নখের নীচে কাঁটার মতন বিঁধে থাকা বারিধীনাথের মন্দিরের কালো চূড়াটার দিকে। যতদূর অবধি সেই চূড়া দেখা যেত ততদূর অবধিই তারা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যেত। তার বেশি আর এক রশি-ও নয়। ওই অবধি ছিল বারিধীনাথের প্রহরা। কোনো ঝড়-বৃষ্টি-জলোচ্ছ্বাস তাদের ক্ষতি করতে পারত না।

তারপর? আমি জিজ্ঞেস করতাম।

লোকে বলে, তখন থেকেই একটু একটু করে পাপ ঢুকছিল গুঞ্জাবালুর পুণ্যক্ষেত্রে। ভগবানের নামে উৎসর্গ করা ধানখেত মন্দিরের সেবায়েতের মুঠোয় ঢুকে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে আসা পুণ্যার্থীদের ওপরে স্থানীয় পুরুত-পাণ্ডা আর ধর্মশালার মালিকদের জোরজুলুম আর লুঠপাট বেড়ে চলেছিল। তীর্থযাত্রীদের দলে কমবয়সি মেয়ে থাকলে সে ধর্মশালার ভেতরেই ধর্ষিতা হত। তবু তখনও অবধি মন্দিরের চত্বরের মধ্যে কেউ কোনো পাপ করার সাহস দেখায়নি।

জেলেপাড়ার সবচেয়ে বদমাইশ দুটো লোকের নাম ছিল বটুয়া আর মানিক। সম্পর্কে ওরা ছিল শালা-জামাইবাবু। আর ওদের নাটের গুরু ছিলেন মন্দিরের প্রধান সেবাইত ত্রিলোকহরি পাণ্ডা। গুঞ্জাবালুর যেখানে যত চুরি-ছিনতাই হত, যত মদ-গাঁজা বিক্রি হত, যত খারাপ পাড়ার কুঠিভাড়া উঠত তার একটা হিস্যা ওই বটুয়া আর মানিকের হাত দিয়ে পৌঁছে যেত ত্রিলোকহরির কাছে।

একদিন গভীর রাতে সেই বটুয়া আর মানিক এসে মন্দিরের খিড়কি-উঠোনে প্রধান সেবাইতের ঘরের দরজা ঠকঠকাল। ঘুমচোখে দরজা খুলে ত্রিলোকহরি খেঁকিয়ে উঠলেন। কী ভেবেছিস কী তোরা? নিজেরা রাত জেগে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়াস বলে কি সবাইকেই

তোদের সঙ্গে রাত জাগতে... বলতে বলতেই ত্রিলোকহরির কথা আটকে গেল। তিনি দেখলেন বটুয়া আর মানিক দুজনের চোখেই কেমন যেন ফ্যালফেলে দৃষ্টি। ঠোঁট কাঁপছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। তিনি তাড়াতাড়ি ওদের হাত ধরে টেনে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে প্রদীপের সলতেটা উসকে দিলেন। তারপর ওদের মুখদুটো ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, নেশা করেছিস বলে তো মনে হচ্ছে না। তাহলে হল কী তোদের?

বটুয়া বলল, ঠাকুরমশাই... মৎস্যকন্যা!

মানিক বলল, হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। এইমাত্র নিজের চোখে দেখে এলাম।

ত্রিলোকহরি হেসে ফেললেন।

ওরা দুজনেই তখন একসঙ্গে বলল, দেখবেন চলুন। এই তো মন্দিরের পেছনেই পাথরের খাঁজে আটকে রয়েছেন।

ত্রিলোকহরি একটু সাবধানি সুরে জিজ্ঞেস করলেন, তোদের কে বলল?

কে আবার বলবে? আজ রাত থাকতেই সমুদ্রে যাব বলে নৌকা বার করতে গিয়েছিলাম। নৌকা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলাম, নৌকা আর পাথরের মাঝখানে বিচ্ছিরিভাবে তিনি আটকে রয়েছেন। ছটফট করছেন। যাবেন পাণ্ডামশাই? চলুন। কী করব, কাকে বলব কিছু বুঝতে না পেরে আপনার কাছেই দৌড়ে এলাম।

ত্রিলোকহরি গায়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরের দরজায় তালা লাগালেন। তারপর ওদের বললেন, চল!

রাতটা ছিল শুক্লপক্ষের। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ত্রিলোকহরি দেখলেন মৎস্যকন্যার অপরূপ রূপ। নিকোবরী কড়ির মতন চকচকে কালো চামড়া। জলঝাঁজির মতন রাশি রাশি কালো চুল। আর মুখ যেন ওই মন্দিরের গায়ের পাথরের যক্ষিনীর মূর্তি থেকেই কেটে বসানো।

তবে এসবই ঊর্ধ্বাঙ্গের কথা। মেয়েটার কোমর থেকে নীচে একটা মাছের শরীর। বিশাল এক মাছ। হাঁটু-ডোবা জলের মধ্যে ল্যাজের ঝাপট দিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল সেই মৎস্যকন্যা।

ত্রিলোকহরি তার চল্লিশ বছরের জীবনে সেই রাতের আগে খুব বেশি আবেগতাড়িত হননি। সেদিন হলেন। তার মনে হচ্ছিল দম আটকে

আসছে। শ্বাস নিতে পারছেন না, অথচ বুকের ভেতর অসীম শূন্যতা। সেই শূন্যতার মাপ ঠিক ওই মৎস্যকন্যার মতন। তবে দীর্ঘদিনের শঠতার অভ্যাসে তাড়াতাড়ি সামলেও নিলেন নিজেকে। বটুয়া আর মানিককে বললেন, একে তোরা দুজনে ধরাধরি করে মন্দিরে নিয়ে চল।

মন্দিরে? বিস্ময়ে শালা-জামাইবাবুর চোয়াল খুলে পড়ার দশা। বটুয়া বলল, মন্দিরে নিয়ে গিয়ে কী হবে ঠাকুরমশাই? এনাকে নিয়ে মেলায় মেলায় ঘুরলে তো লাল হয়ে যেতাম।

ত্রিলোকহরি বললেন, সে হবে। তবে এখনই নয়। এখন এর কথা জানাজানি হলে গভর্নরসাহেব তোদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তারপর বিলেতে পাঠিয়ে দেবেন, মহারানিকে ভেট দেওয়ার জন্যে। সেইজন্যেই বলছি, কদিন মন্দিরে লুকিয়ে রাখি। তার মধ্যে আমি পেছনের ব্যবস্থাপত্র সেরে ফেলব।

বটুয়া আর মানিকের মুখ ঝলমলে হয়ে উঠল। তারা দুজনে মিলে মৎস্যকন্যাকে ধরাধরি করে মন্দিরের বেদির নিচে যে-চৌবাচ্চায় প্রভুর চানের জল জমা করা হত, সেই চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে দিল। তারপর তারা চলে গেল মাছ ধরতে। ঠাকুরমশাই পইপই করে বলে দিয়েছিলেন কাউকে কিছু না বলতে। তবে সে-কথা তারা পুরোপুরি রাখতে পারেনি। মানিকের বউ রম্ভা প্রতিদিনের মতন ওর সঙ্গে জাল বয়ে নৌকায় নিয়ে যাচ্ছিল। মানিক থাকতে না পেরে রম্ভাকে বলে ফেলেছিল মৎস্যকন্যার কথা।

মোদ্দা কথা হল, এইভাবেই প্রথম পাপ ঢুকল মন্দিরে।

পাপ কেন? – জিজ্ঞেস করলাম।

তখন আরকের বিষে আমার মনে হচ্ছিল নায়েকের নেশাঘর আর নেশাঘর নেই; হয়ে উঠেছে কোনো অবলুপ্ত মন্দিরের গর্ভগৃহ। সেখানে একটা মাত্র ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। আমার পায়ের কাছে পাথরের চৌবাচ্চা – মায়ের গর্ভজলের মতন অন্ধকার, শীতল তার জল। তার মধ্যে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে মৎস্যকন্যা। সে মাথা ঝাঁকালে তার চুলের জলের ছিটে আমার মুখে এসে লাগছে। তার চোখে চোখ পড়ে গেলে কেঁপে উঠছে আমার অন্তরাত্মা।

রঘু নায়েকও কিছুক্ষণের জন্যে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। আমি আবার বললাম,পাপ কেন?

রঘু একবার উঠে গিয়ে শুঁটকি মাছের কড়াই নাবিয়ে উনুনে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে এল। তারপর আবার আমার সামনে হাতের মধ্যে দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসল। বলল, পাপ-ই তো। মন্দিরের ভেতরে ত্রিলোকহরি পাণ্ডা কামার্ত হলেন। মৎস্যকন্যার শাঁখের মতন গলা, মহীসোপানের মতন ঢালু তলপেট, ট্যাঁপামাছের মতন নিটোল গোল স্তন আর বজ্রকীটের খোলসের মতন নাভি দেখতে দেখতে তিনি ভুলে গেলেন যে, তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন মন্দিরের ভেতরে। রাত যখন ভোর হয়ে আসছে তখন তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন চৌবাচ্চার ভেতরে। জড়িয়ে ধরলেন মৎস্যকন্যাকে।

তীব্র সংগমের ইচ্ছায় মরে যাচ্ছিলেন ত্রিলোকহরি, কিন্তু সংগত হবেন কেমন করে? যোনি কই? মৎস্যকন্যার কোমর থেকে নীচে পুরোটাই তো আঁশ দিয়ে ঢাকা। মরিয়া ত্রিলোকহরি আবার চৌবাচ্চার কানা ধরে ওপরে উঠে এলেন। হাতে তুলে নিলেন ঝুনো নারকেলের খোসা ছাড়ানোর ধারালো দা-খানা। তারপর চৌবাচ্চায় নেমে মৎস্যকন্যার নাভির নীচে সেই দা বসিয়ে দিয়ে চিরে দিলেন তার পুচ্ছ অবধি গোটা শরীরটাই।

হয়তো সে-রাতে মৎস্যকন্যার আর্তনাদ পুরো গুঞ্জাবালুকেই কাঁপিয়ে দিত। কিন্তু ততক্ষণে বাইরে শুরু হয়ে গেছে অন্য এক কলরোল। সমুদ্র থেকে ছুটে আসা এক অসময়ের তুফানের হাড় হিম করা গর্জন। পাহাড়প্রমাণ সব ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার আওয়াজ। সেই রুদ্র হুংকারের নিচে মৎস্যকন্যার আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।

বিস্ফারিত চোখে ত্রিলোকহরি দেখলেন, মাছের শরীরের নিচে শুধুই মাছের শরীর। উরু, জঙ্ঘা কিছুই নেই। শুধুই উরুসন্ধি। আর সেখান থেকেই জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়েছে এক ছোট্ট মানবশিশু।

'মানবশিশু' কি বলা যায় তাকে! মানবশিশুর মুখে কি জন্মলগ্নেই অমন ঝকমকে দু-পাটি দাঁত থাকে? সে কি অমন শয়তানের মতন ত্রিলোকহরির চোখে চোখ রেখে হাসতে পারে? কোনো মানবশিশু কি অমন ফলুইমাছের মতন শরীর বাঁকিয়ে লাফ মেরে উঠে আসতে পারে গভীর চৌবাচ্চার নীচ থেকে ওপরে, শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মন্দিরের মেঝেয়?

পায়ের কাছে জলের মধ্যে মৎস্যকন্যার অচেতন শরীর। মাথার কাছে চৌবাচ্চার কিনারায় মৎস্যকন্যার গর্ভনিষ্ক্রান্ত সেই শিশু। এই অবস্থায়

ত্রিলোকহরি দেখলেন শিশুটি মন্দিরের ছাদের দিকে তাকিয়ে 'আয় আয়' বলে কাকে যেন ডাকল আর মুহূর্তের মধ্যে বারিধীনাথের মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়ল নীচে। ঢেকে ফেলল সবকিছু।

এখনও আপনি জেলে পাড়া থেকে পশ্চিমে আড়াইমাইল হেঁটে গেলে দেখতে পাবেন সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

আমি আরকের খালি বোতলটা বাইরে ছুড়ে দিয়ে কাচভাঙার ঝনঝন শব্দটা মন দিয়ে শুনলাম। তারপর রঘু নায়েককে জিজ্ঞেস করলাম, বাকিদের কী হল?

বাকিদের মানে?

মৎস্যকন্যা।

জানি না। কোমরকাটা অবস্থায় সমুদ্রে তো সে আর ফিরে যেতে পারেনি নিশ্চয়ই। তাহলে এই গুঞ্জাবালুতেই কোথাও থেকে গিয়েছিল। কিংবা এখনও হয়তো আছে। মৎস্যকন্যাদের আয়ু যে কতবছর তা তো আমরা জানি না।

ত্রিলোকহরি? বটুয়া? মানিক?

তিনজনেই সেই রাত্তিরেই মারা গিয়েছিল। ত্রিলোকহরি মন্দিরের পাথর চাপা পড়ে। বটুয়া আর মানিক তুফানি সমুদ্রে ডুবে।

আর সেই বাচ্চাটা?

সে-ই তো যমন অবতার। সে নানান সময়ে নানান রূপে গুঞ্জাবালুতে ঘুরে বেড়ায়। এই শহর ছেড়ে তার অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই।

মৎস্যকন্যার কথা, পাপের ভারে মন্দির ভেঙে পড়ার কথা, মৃত্যুমুখী যমন অবতারের কথা — সবই বারিধীনাথের মন্দিরের মাদলাপুথিতে ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে বলা ছিল। মন্দির নষ্ট হয়ে গেলেও সেই মাদলাপুথির একটা কপি আমার কাছে আছে। দেখাব একদিন আপনাকে।

এখন যান। দোকান বন্ধ করব।

।। দুই ।।

মহান্ত নিবাসের বাগানে একা একা খেলা করছে যমন। কী খেলা খেলে ও? কৌতূহল হয়। পা টিপে টিপে ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, ঘাসের ডগায় দুটো ফড়িং। একটা আর একটাকে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে। এমনই শান্ত ওদের সংগম যে, সেই সরু ঘাসের ডগাটুকুও একটু কাঁপছে না।

কিন্তু আমি কেঁপে উঠলাম। কারণ ততক্ষণে আমি দেখতে পেয়েছি যমনের হাতে একটা ম্যাগনিফাইং-গ্লাস। সেই সস্তার ম্যাগনিফাইং-গ্লাসের কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে যমন আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফড়িংদুটোর দিকে। আমি কিছু করে ওঠবার আগেই মাংস পোড়ার গন্ধ উঠল। সামান্য সাদা ধোঁয়ার রেখা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। দুটো কুঁকড়ে যাওয়া শরীর খসে পড়ল জমির ওপরে।

সেদিন রাতেই গুঞ্জাবালুর একটা বাড়ির বেডরুমে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগল। মারা গেলেন এক নারী ও পুরুষ।

যমনের এমনই সব খেলা। ও যদি দেখে একটা বুড়ো টিকটিকি দরজার পাল্লার ফাঁকে চেপটে গিয়ে ছটফট করছে তাহলে ওর মনে আনন্দের বান ডাকে। ও রান্নাঘর থেকে চিনির কৌটো নিয়ে গিয়ে পিপড়ের গর্তের মুখ থেকে সেই আটকে পড়া টিকটিকির কাছ অবধি একটা মিষ্টি রাস্তা বানিয়ে দেয়। আধমরা টিকটিকিটা যখন দেখে, কালো পিপড়ের সারি নির্ভুল লক্ষ্যে তার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তার কালো পুতির মতন চোখেও মৃত্যুভয় ফুটে ওঠে। আর এমন সব দিনেই কনস্ট্রাকশন-সাইটের স্ক্যাফোল্ড থেকে একটা লোহার বিম খসে পড়ে এক বুড়ো লেবারের কোমরের ওপরে। সে মারা যায়।

আমি সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর সোমকে ফোন করে বলি সব কথা। বলি এই যমন নামের ছেলেটা যতক্ষণ আমার কাছে থাকবে, ততক্ষণ আমার মাথার যন্ত্রণা সারার কোনো সম্ভাবনা নেই। ডক্টর সোমকে যমনের জন্মবৃত্তান্ত আর ওর মৃত্যুকে পথ দেখিয়ে ডেকে আনার ক্ষমতার কথাও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। কিন্তু উনি ভরাট গম্ভীর গলায় আমাকে থামিয়ে দেন। বলেন, শুনুন শুনুন মোহনবাবু। যমন নয়, সুমন। সুমনের জন্মবৃত্তান্ত আপনার অজানা থাকার কথা নয়, কারণ আপনি ওর বাবা।

আপনিই ওকে নিয়ে গেছেন আপনার অ্যানসেসট্রাল হোম গুঞ্জাবালুতে, যদিও আমি আপনাকে বারণ করেছিলাম।

আমি ডাক্তারের এমন বিকারগ্রস্ত কথাবার্তায় স্তম্ভিত হয়ে যাই। যমন নয়,সুমন! সে নাকি আবার আমার ছেলে? এটা কেমন করে সম্ভব? ও তো মৎস্যকন্যার পেট থেকে বেরিয়েছিল। তখন আমি কোথায়?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফোনের ওপাশ থেকে ডক্টর সোম খুব উদ্‌বিগ্ন গলায় বললেন, শুনুন মোহনবাবু। আপনি কলকাতায় ফিরে আসুন... হ্যাঁ, সুমনকে নিয়েই। আপনার ডাইভোর্সড স্ত্রী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। উনি বলেছেন সুমনের কাস্টডি উনি আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কী বললেন?

কিছু মনে করবেন না। আমারও মনে হল সেটাই ভালো হবে। ইনফ্যাক্ট আমি ওঁকে এ ব্যাপারে যা এভিডেন্স লাগবে দিয়ে দেব। আর এতে তো আপনারও ভালো হবে, বলুন। আপনাকে আর সারাক্ষণ যমনের ভয়ে থাকতে হবে না।

আর আপনাকে দু-নম্বর যে ওষুধটা দিয়েছিলাম, সেটা আজ থেকেই দুটোর বদলে তিনটে করে খান। বুঝেছেন? কী হল? উত্তর দিচ্ছেন না যে!

ঘোড়াড্ডিম উত্তর দেব। শালা, পাগলদের সঙ্গে মিশে-মিশে ডাক্তারটা নিজেই পাগল হয়ে গেছে। ফোন সুইচ অফ করে আমি ঘর থেকে বাইরে বেরোলাম।

রাত হয়েছে। অনেক রাত। যে মাসি আমাদের রান্নাবান্না করে, সে একটু আগে আমাদের রাতের খাবার দিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

সুমনকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। গেল কোথায় সেই মৃত্যুর অবতার?

এই মহান্ত নিবাস বাড়িটার প্ল্যান খুব অদ্ভুত। কোথাও ঘরের মধ্যে দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। কোথাও একটা দরজা খুললে দেখা যাচ্ছে ওপাশে কিছুই নেই। খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। আর বারান্দাগুলোর কথা তো যত কম বলা যায় ততই ভালো। তারা কেবলই শাখাপ্রশাখায় ভেঙে যাচ্ছে। কোনোটা ওপরে উঠে যাচ্ছে, কোনোটা নীচে নেমে যাচ্ছে। এক-

এক সময় মনে হয় সেই প্যাঁচানো পথে যেতে-যেতে নিজেই নিজের পিঠ দেখতে পাব। দেখব আমার সামনে আমিই হেঁটে যাচ্ছি।

এইজন্যেই আমাদের বংশে আত্মহত্যা এত বেশি। নিজের সামনে নিজের পিঠ দেখতে পেলে গলায় দড়ি পেঁচিয়ে ধরার কিংবা পিঠে বেশ ধারালো একটা ছুরি গেঁথে দেওয়ার লোভ সংবরণ করা কি সহজ কথা? আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা এখানে থাকতেন তাদের মধ্যে চারজন সুইসাইড করেছিলেন বলে জানি। তার মধ্যে একজন আমার বাবা।

মাসি অবশ্য সকালে কলতলায় কাপড় কাচতে-কাচতে গজগজ করছিল —পাগলের গুষ্টি! অশিক্ষিত মহিলা। জানেন না, পাগলামি দিয়ে সব কিছুকে এক্সপ্লেইন করা যায় না। পাগলামিটা আসলে এই বাড়ির ব্লু-প্রিন্টের অংশ।

যমনকে শেষ অবধি খুঁজে পেলাম ছাদে। একটা সবুজ রাংতার ল্যাম্পশেডের মতন কী যেন বানিয়ে, সেটাকে চিলেঘরের কার্নিশে একটা আংটায় টাঙানোর চেষ্টা করছিল। আমি কড়া গলায় প্রশ্ন করলাম, কী হবে ওটা দিয়ে?

যমন বলল, কিছু না।

'কিছু না' বলেও কিন্তু ও সেই রাংতার ল্যাম্পশেডটার মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বেলে দিল।

একটু বাদে একটা পাখি তিরবেগে উড়ে এসে ওই আলোটার পাশে দেয়ালে মাথা ঠুকে ছাদের ওপর পড়ে গেল। দু-একবার ডানা ঝাপটিয়ে স্থির হয়ে গেল। পাখিটার সাদা পালক, কালো মাথা। সমুদ্রের ওপরে এরকম পাখিদের ঝাঁক বেধে দিনরাত ওড়াউড়ি করতে দেখেছি।

একটু বাদে একইভাবে আর একটা পাখি যমনের আলোর ফাঁদে পড়ে মরল। তারপর আর একটা। আধঘণ্টার মধ্যে তিনটে পাখিকে এইভাবে মরতে দেখে আমি যমনের হাতের নড়া ধরে টান দিলাম। বললাম, ছেড়ে দাও ওদের। নিভিয়ে দাও লণ্ঠনটা। তুমি কি কাউকেই বাঁচতে দেবে না?

এই প্রথম ওর এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি বলেই বোধহয় বুঝতে পারলাম, যমনের গায়ে মাছের আঁশটে গন্ধ। আর ওর বারমুডার নীচে বেরিয়ে থাকা সরু পায়ের চামড়ায় আঁশের মতন কীসব দাগ ফুটে

বেরিয়েছে। ও যে মৎস্যকন্যার সন্তান সে ব্যাপারে ক্রমশই নিশ্চিত হচ্ছিলাম।

যমন আমার কথা শুনে কাগজের লণ্ঠনটা নিভিয়ে, মুহূর্তের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি কী করব ভেবে না পেয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

এখন বাজে রাত্রি এগারোটা। সমুদ্রর দিক থেকে ভীষণ জোরালো একটা হাওয়া ছেড়েছে। হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দের সঙ্গে ঢেউ ভাঙার গর্জন মিলেমিশে একটা অদ্ভুত এফেক্ট তৈরি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বাইরে কোথাও নয় – ওই শব্দ যেন আমার নিজের মাথার ভেতরে তৈরি হচ্ছে। আমি সমুদ্রের থেকে দূরে পালানোর জন্যেই স্টেশনের দিকে পা চালালাম।

গুঞ্জাবালুর সমস্ত রাস্তার ওপরেই সর্বক্ষণ বালির স্তূপ জমে থাকে। সেই ভারী বালি ঠেলে হাঁটতে গিয়ে আমার হাওয়াই চটির একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। আমি দুটো চটিই লাথি মেরে সরিয়ে খালি পায়েই হাঁটতে লাগলাম স্টেশনের দিকে। মাত্রই তো দু-কিলোমিটার রাস্তা; মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছেও গেলাম।

মূল স্টেশনবাড়িকে বাঁ হাতে রেখে হেঁটে গেলাম গুদামঘরের দিকে। এতক্ষণ অবধি হ্যালোজেন ল্যাম্পের হলুদ-আলোর ছিটেফোঁটা আমার চলাটাকে সহজ করছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে গুদামঘরটাকে বেড় দিয়ে পেছনের পায়ে চলা রাস্তায় উঠলাম সঙ্গে সঙ্গেই তারার আলো ছাড়া আলো বলতে আর কিছুই রইল না।

পুঁটুশফুলেরা এত রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের ঝাঁঝালো গন্ধের বদলে হিমে ভেজা ধুলোর একটা মনকেমন করা গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। অতসিফুলগুলোকে এই অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই নেই, তবে তাদের শুকনো ফলের ঝুমঝুম শব্দ আমাকে রাটল-স্নেকের মতন অনুসরণ করছিল। এতক্ষণ পরে আমার মনে হল, ঠিক করলাম কি এত রাতে এখানে এসে? কেনই বা এলাম? এখন তো নিশ্চয়ই রঘু নায়েক দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু না। অবাক হয়ে দেখলাম, রঘু ঘুমোয়নি। ওর ঘরের দরজা বন্ধ ঠিকই, কিন্তু রঘু নিজে দরজার বাইরে একটা খাটিয়ার ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ভীষণ খুশি হলাম। সন্ধের পর রাতটাও যদি এইভাবে

রঘুর সঙ্গে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তো আমার আর কোনো সমস্যাই থাকে না।

আমাকে দেখতে পেয়ে রঘুর মুখে কোনো বিকার এল না। যেন ও জানত আমি আসব। নিজের পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে থাবড়ে বলল, বসুন ছোটোবাবু।

আমি বললাম রঘু, তুমি আর আমি তো প্রায় এক বয়সিই হব। আমি বড়ো হয়েছি কলকাতায় আর তুমি এই গুঞ্জাবালুতে। তবে মনে হয় মাঝে কখনও আমাদের দেখা হয়েছিল। কোথায় বলতে পারো?

রঘু বলল, এই গুঞ্জাবালুতেই, আর কোথায়? আপনি সব ভুলে যাচ্ছেন। আমরা বংশানুক্রমে আপনাদের ওই মহান্ত নিবাসের কেয়ার-টেকার। আমার জন্ম ওই বাড়িতে। আপনি শেষবার এসেছিলেন চোদ্দোবছর আগে, আপনার বিয়ের পরে।

আমার বিয়ে হয়েছিল?

রঘু কেমন একটা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হয়েছিল বই কি।

কার সঙ্গে?

কলকাতার মেয়ে। ভাব-ভালোবাসা করে বিয়ে করেছিলেন। তার বেশি কিছু মনে পড়ছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকালাম। যেন সেখানেই কোটি কোটি তারার বিন্দু দিয়ে লেখা হয়ে যাবে আমার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীর নামঠিকানা।

একটু বাদে রঘু নীরবতা ভেঙে বলল, আপনাকে মাদলাপুথি দেখাব বলেছিলাম। দেখবেন?

আমি চনমন করে উঠলাম। ওই পুথি দেখতে পেলে বড়ো ভালো হয়। কেবলই মনে হয়, আমিও যেন মৎস্যকন্যা আর যমনের সঙ্গে কোথাও সংযুক্ত। আমার এই যে অনুক্ষণ মাথার যন্ত্রণা, মাঝে মাঝেই অনেক কিছু মনে না পড়া – এইসব অসুখ সেরে যাবে যদি ওই সম্পর্কটা একবার খুঁজে বার করতে পারি। তাই রঘুর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, দেখাও না ভাই।

রঘু বলল, না ছোটোবাবু। এখন হবে না। কাল খুব ভোরে চলে আসুন, দেখিয়ে দেব। আর শুনুন, আমার কাছে কয়েকটা কাগজ আছে।

সেগুলোতে সই করে দিতে হবে।

কেন? কিসের কাগজ? আমি রঘুর কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রঘু রাগি-গলায় বলল, কেন আবার কী? পুথি দেখাব, তার দাম দেবেন না? মহান্ত নিবাসের ওই বাড়িটা তো আপনার কোনো কাজে লাগছে না। ওটা আমাকে লিখে দিন। আচ্ছা শুনুন, আপনাকে আমি পুথির থেকেও ভালো জিনিস দেখাব।

কী? কী? — আমি উৎসাহের চোটে রঘুর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম, কিন্তু রঘু আমাকে ঠেলে সোজা করে বসিয়ে নিজে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়েই রঘুর নেশাঘরের দরজাটা ভেতর থেকে ফটাস করে খুলে গেল আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন চুনোট-করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক বয়স্ক ভদ্রলোক। বেশ সমীহ জাগাবার মতন চেহারা। পাকানো মোচ, এই মাঝরাত্তিরেও পরিষ্কার করে কামানো গাল। দশ আঙুলের আংটিগুলো অন্ধকারে ঝিলিক দিচ্ছিল। ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই ভালো জর্দার সুগন্ধ পেলাম।

রঘু তাড়াহুড়ো করে ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উনি রঘুর হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি আবার কে?

রঘু ফিসফিস করে কী বলল শুনতে পেলাম না। তবে উনি বেশ জোরগলাতেই বললেন, ও! আদিনাথ মহান্তর সেই বাউড়া ছেলেটা? পরি-টরির পেছনে ঘোরে শুনেছি। ওকে এখানে এনেছিস কেন?

রঘু এই কথার উত্তরেও কী বলল শোনা হল না।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পরে আমি রঘুকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মদের ঠেক কি রাতের বেলাও খোলা রাখছ নাকি?

রঘু গম্ভীর গলায় বলল, না। অন্য ব্যাপার। কালকে বলব। এখন যান। ঘুমোব। কাল ভোরবেলায় মনে করে চলে আসবেন। আমার এই নেশাঘরে ভোরটুকুই শান্তি করে কথা বলার সময়। দুপুরের পর থেকেই তো আবার ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে যাবে।

রঘু আমাকে এইভাবে তাড়িয়ে দেবে ভাবিনি। মনখারাপ নিয়েই উঠে পড়লাম। আবার সেই জঙ্গলে ঢাকা রাস্তা ধরে রেলওয়ের গুদামখানার সামনে এসে ওঠামাত্রই দেখতে পেলাম, যমন একটু দূরে একটা

ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেমন অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। প্রচণ্ড ভয় পেলাম। এবার কি আমার পালা? ও কি আজ এই মুহূর্তেই আমার মৃত্যুকে ডেকে আনবে?

তেমন কিছু করল না অবশ্য। ছোটো ছোটো পায়ে আমার পাশে-পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি এইভাবে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ো কেন? আমার ভীষণ ভয় করে যে!

যমন অবতারের ভয়! এমন আশ্চর্য কথা কে কবে শুনেছে? পাত্তা না দিয়ে বললাম, তোমার আজকের মিশন সাকসেসফুল, তাই তো যমন?

যমন বড়ো বড়ো চোখদুটো তুলে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললাম, ইকুয়েশন তো খুব সহজ। তিনটে পাখি। তিনটে লরি। হাইওয়ের ওপরে যেখানে পুরোনো ব্রিজের পাশে নতুন ব্রিজটা তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে লাল আলোটা সরিয়ে কেউ সবুজ আলো জ্বেলে দিয়েছিল। তিনটে লরিই ফুল স্পিডে ওই অর্ধেক তৈরি হওয়া ব্রিজের মাথায় উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চল্লিশ ফুট নীচে রিভারবেডে। ড্রাইভার খালাসি মিলিয়ে মোট ছটা লোক মারা পড়েছে।

যমন ক্লান্ত গলায় বলল, এরকম কিছু হয়নি। তুমি নিজেই বানাচ্ছ।

তুমি আজ ছাদের ওপরে সবুজ লণ্ঠন জ্বালোনি?

যমন বলল, হ্যাঁ, জ্বেলেছিলাম। আমি লাইটহাউস-লাইটহাউস খেলছিলাম। সমুদ্র দিয়ে যেন জাহাজ যাচ্ছে আর আমি তাদের আলো দেখাচ্ছি।

তুমি সেদিন ফড়িং দুটোকে পুড়িয়ে মারোনি?

পুড়িয়ে মেরেছি! যমন এতটাই অবাক হল যে চলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, আমি ম্যাগনিফাইং-গ্লাস দিয়ে ওদের ডানার সরু-সরু ডিজাইনগুলো দেখছিলাম। মজা লাগছিল দেখতে। কিন্তু তখন তো সকাল। রোদ ওঠেনি। ওরা পুড়বে কেমন করে?

আমার আর তর্ক করতে ভালো লাগছিল না। জানি, ও টিয়াপাখি কিংবা টিকটিকির কথাও অস্বীকার করবে। তাই চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম।

মহান্ত নিবাসের সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছি তখন হঠাৎ যমন পেছন থেকে বলল, মা তোমাকে ফোন করেছিল। তুমি ছিলে না, তাই আমিই কথা বললাম।

আমি সিঁড়ির মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, তোমার মা? তারপর প্রায় এক দৌড়ে সিঁড়ির বাকি কটা ধাপ পেরিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে পৌঁছিয়ে মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে কল-রেজিস্টার খুললাম। হ্যাঁ, ফোন এসেছিল। সুকন্যা নামে কেউ ফোন করেছিল।

'সুকন্যা' নয়। আসলে 'মৎস্যকন্যা'। যুগের সঙ্গে মানানসই করে নামটা সামান্য পালটিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এই কল থেকেই প্রমাণ হল, মৎস্যকন্যা আছে। হয়তো এই গুঞ্জাবালুর কাছাকাছিই কোথাও আছে। দেড়শো বছর ধরে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি মৎস্যকন্যাকে কল-ব্যাক করলাম। ফোন বলল, নট রিচেবল।

আমি মোবাইলটা কান থেকে সরানোর পর যমন বলল, মা কাল সকালে এখানে আসছে। বলেছে, তার মধ্যে যেন তোমার কোনো বিপদ না ঘটে দেখতে।

আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। মনে পড়ল, রঘু নায়েক কথা দিয়েছে কাল আমাকে মাদলাপুথির থেকেও বেশি আশ্চর্য একটা কিছু দেখাবে। এদিকে মৎস্যকন্যাও কাল আসছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তাহলে কি... তাহলে কি রঘু মৎস্যকন্যার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেওয়ার কথাই বলছিল?

খোলা জানলার শিকগুলো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বাইরে তাকালাম। এক আকাশ তারার নীচে আদিগন্ত সমুদ্র। ব্রেকারের সাদা ফেনার রেখা একবার করে ময়াল সাপের মতন ফুঁসে উঠেই আবার কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সারাক্ষণ মেঝের ওপরে লোহার বল গড়ানোর মতন সেই ঢেউ ভাঙার শব্দটা। এইসব দেখতে দেখতে আমি মনে-মনে বললাম, মৎস্যকন্যা সুকন্যা! তোমার সঙ্গে আমার কি গতজন্মে দেখা হয়েছিল? আমিও কি তখন সমুদ্রের নীচে থাকতাম? আমরা দুজনে মিলে কি প্রবালের জঙ্গলে জলজ শৈবালের ঘ্রাণ বুকে নিয়ে পাশাপাশি সাঁতার কাটতাম?

তারপর কি সেই সর্বনাশের দিন এল সুকন্যা? তুমি ঢেউয়ের টানে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে? তোমার শরীরের নীচের অংশ দা-এর কোপে কেটে ফেলল এই গুঞ্জাবালুর নষ্ট পুরোহিত?

হঠাৎ যমন আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে ডাকল – বাবা!

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। এরকম চোখ কার যেন ছিল? মৎস্যকন্যার কি? অচেনা এক মায়ার স্রোতে আমার বুকের সমস্ত অজানা গহ্বর-কন্দর কুলকুল করে ভরে উঠল। আমি বললাম, কী বলছিস?

যমন বলল, আমি আজ তোমার কাছে শোব। মা বলেছে তোমাকে আগলে রাখতে।

আমি ওর রেশমের মতন নরম চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বললাম, চল। শুয়ে পড়ি।

।। তিন ।।

বেচারা যমন। ওর সাধ্য কী আমাকে আগলায়। ভোরের আকাশে রং ফুটবার আগেই বেরিয়ে পড়েছি স্টেশনের উদ্দেশে।

পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, ঢেউয়ের সাদা ফেনায় গোলাপির আভা, যেন একদিন বারিধীনাথের মন্দিরের নালা বেয়ে মৎস্যকন্যার যে-রক্ত সমুদ্রে গিয়ে মিশেছিল সেই রক্তই আজও ঢেউয়ের মাথায় নাচছে।

একরকম দৌড়োতে দৌড়োতেই পৌঁছে গেলাম স্টেশন চত্বরে। তখনও প্রথম ট্রেন ঢোকেনি। ফাঁকা প্লাটফর্মে দু-চারজন মানুষ চাদর মুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করছে। মাল-গুদামকে পেছনে ফেলে পায়ে চলা রাস্তাটায় ঢুকলাম। পুঁটুশ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র বুলবুলিপাখির কলকলানি। ফল পাকছে।

রঘু বোধহয় দরজার পাল্লা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে চট করে পাল্লাটা খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল।

চেনা ঘর। চেনা সব কিছুই। সেই ব্রিটিশ-আমলের গার্ডসাহেবের লণ্ঠন, দুদিক আলো আর দুদিক অন্ধকার করে জ্বলছে। দেয়ালের তাকে শাঁখামুটি সাপের ডোরার মতন পর-পর লাল-কালো-হলুদ আরকের বোতল সাজানো। অচেনা শুধু ওই মেয়েটা, যে অন্ধকার দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছে।

আমি ওর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। রঘু পেছন থেকে আমাকে ডাকল। দাঁড়ান ছোটোবাবু! কাগজগুলোয় একটু সই করে যান।

আমি অন্ধের মতন ওর হাত থেকে কলম টেনে নিয়ে সই করতে শুরু করলাম। আমার হাত কাঁপছিল। সেই অবস্থাতেই কোনো রকমে রঘুকে জিজ্ঞেস করলাম, রঘু! এই কি তাহলে...?

রঘু চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ। মৎস্যকন্যা।

এতদিন কোথায় ছিল?

কেন? আমাদের বাড়িতেই। এখন আমার কাছেই থাকে।

কিন্তু কেমন করে? তোমার কাছে কেমন করে?

রঘু ধূর্তের মতন হেসে বলল, মানিকের কথা মনে পড়ে তো ছোটোবাবু? তার বউ রম্ভার কথা? ওরা ছিল আমারই পূর্বপুরুষ।

রম্ভা তো জানত, মন্দিরের ভেতরে মৎস্যকন্যা রয়েছে। তুফানের ধাক্কায় বিরাট আওয়াজ করে মন্দির ধসে পড়ামাত্রই সে ছুটে গিয়েছিল মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের দিকে। আর সকলে যখন নিজেদের বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন রম্ভা পাঁজাকোলা করে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল মৎস্যকন্যাকে। সেই থেকে এ আমাদের কাছেই রয়েছে। দেড়শো বছর আগে যেমন ছিল, আজও তেমনই রয়েছে। এর জন্যেই যমনও গুঞ্জাবালু ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না।

যান। দেখুন গিয়ে।

আমি মেয়েটার পাশে মেঝের ওপরে হাঁটু গেঁড়ে বসে ওর গায়ের চাদরটা আস্তে করে সরিয়ে দিলাম। অনাবৃত হল কোমর অবধি শরীর। ঠিক যেমনটা রঘু বলেছিল। শঙ্খের মতন নিটোল গলা, নিকোবরী কড়ির মতন গায়ের রং। ছোটো কিন্তু সুগঠিত দুই স্তন আর গভীর নাভি।

দেখলাম ওর অজস্র চুলের মধ্যে জেগে আছে টানা-টানা ভুরু, দুটো ভারী চোখের পর্দা আর দীর্ঘ পল্লবের সারি। চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে মৎস্যকন্যা। ওপরের পাটির ঝকঝকে একসারি দাঁতে কামড়ে ধরেছে নীচের ঠোঁট। চাপা-নাকের পাটায় পেতলের বেসর আর ঘামের কুচি মিলেমিশে ঝিলিক মারছিল।

ও সংগমের প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু...।

আমি একটানে চাদরটা সরিয়ে দিলাম কোমর থেকে নীচে।

সেখানে এক বিশাল শূন্যতা।

মেয়েটার পা নেই। উরু থেকে দুটো পা-ই নিখুঁতভাবে কাটা।

রঘু একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা-পাওয়া চোখে আমার কাণ্ড দেখছিল। আমাকে মুখ তুলে তাকাতে দেখে বলল, দেখছেন কী? মৎস্যকন্যা! শুধু পা দুটোই নেই, বাকি সব তো রয়েছে। নিন, আপনি শুরু করুন। আমি বাইরে বসছি।

যেতে যেতে আবার বলল, এইজন্যেই আপনাকে ভোরবেলায় আসতে বলেছিলাম। একটু বাদে আপনি নিজেই বলবেন, এই স্বর্গীয় অভিজ্ঞতার কাছে একটা পুরোনো অকেজো বাড়ির মালিকানা কিছুই না।

আবার যখন বাইরে বেরোলাম, তখন রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। একটা নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। রাস্তাটার দুদিকে ঝাউ গাছের সারি। তার ওদিকে পরপর সুন্দর দোতলা-তিনতলা বাড়ি। বোঝাই যায়, শহরের অভিজাত এলাকা এটা। ওরকমই একটা বাড়ির গেটের কাছে এক ভদ্রলোক একটা বিদেশি কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি কুকুরটাকে খেয়াল করেছিলাম, মালিককে নয়। হঠাৎ সেই মালিক আমাকে ডাক দিলেন —ওহে, শোনো, শোনো!

আমি চমকে তাকালাম। দেখলাম, গতরাতের সেই রহিস ভদ্রলোক, যিনি রঘুর ঘর থেকে বেরিয়ে রঘুর হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন বাউড়া।

একটু বিরক্ত লাগছিল, তবু কাছে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী বলছেন?

রঘুডাকাতের খপ্পরে পড়েছ। ধনেপ্রাণে মারা যাবে। তোমার বাবাকে চিনতাম। ভালো লোক ছিলেন। আমার মতন জানোয়ার নন।

আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রলোক তীব্র দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা অবধি মাপলেন। তারপর বললেন, কোথায় গিয়েছিলে? কী দেখলে?

আমি বললাম, মৎস্যকন্যা। কিন্তু আমি কিছু করিনি। আমার খুব মায়া লাগছিল। কোমরের নীচে কীরকম কাটা দাগ!

বললাম না, তোমার শরীরে ভদ্রলোকের রক্ত রয়েছে। তুমি পারবে না। আমি পারি। আমার আবার মনে হয় বাহুল্য-টাহুল্য বাদ দিয়ে আসল জিনিসটাই সামনে সাজিয়ে দিয়েছে। সে যাক। যেটা দেখলে সেটা

কীসের দাগ বলো তো।

ওই তো... ত্রিলোকহরি পাণ্ডার দায়ের কোপ।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার মুণ্ডু। রেলের চাকার দাগ। ওই মেয়েটার নাম শিবি। ওয়াগনের মাথা থেকে সিমেন্টের বস্তা নামাতে গিয়ে ওয়াগনের চাকার নীচে পা-দুটো চলে গিয়েছিল। তখন ওর পনেরো-বছর বয়স। সেই থেকে রঘু নায়েকের কবজায় রয়েছে। দিনের বেলায় প্ল্যাটফর্মে বসে ভিক্ষে করে। কোমরের নীচে একটা ছেঁড়া গাড়ির টায়ার বেঁধে ঘষটে ঘষটে চলে। আর রাতের বেলায় খদ্দের বসায়।

মেয়েটার বাজার ভালো; যেমন বাচ্চা মেয়েদের বাজার ভালো, বেঁটে বামন মেয়েদের বাজার ভালো, তেমনি পা দুটো কাটা বলেই অনেক ব্যাটাছেলের ওকেই বেশি ভালো লাগে। পুরুষমানুষের পারভারশনের কথা আর কী বলব? আয়নায় নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে না। তবে ভিক্ষের টাকাই হোক কী খদ্দের বসানোর টাকা, শিবি তার থেকে প্রায় কিছুই পায় না। সবই ঝেড়ে দেয় ওই রঘুডাকাত।

আমি বললাম, বিশ্বাস করি না। ও মৎস্যকন্যা।

আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোমার বাড়ির আশেপাশের লোককেই জিজ্ঞেস করে দেখো। কদিন আগে অবধি তো তোমাদের মহান্ত নিবাসেই মেহফিল বসত। তুমি এখানে এসে পড়ায় আমাদের বড্ড অসুবিধে হয়ে গেছে। তুমি যাবে কবে?

আমার নাকচোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল। একটা বড়ো পাথর তুলে নিয়ে লোকটার মাথা তাগ করে বললাম – যাব না, যাব না, যাব না। এখানেই থাকব।

আরও কিছু করে বসার আগেই ওনার হাতের বকলসে বাঁধা সেই বিশাল কুকুরটা আমার টুঁটি কামড়ে ধরার জন্যে যথাসাধ্য একটা লাফ মারল আর ভদ্রলোকও কুকুরটাকে কোনোরকমে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

মহান্ত নিবাসে ঢোকার আগেই দূর থেকে দেখলাম, পোর্টিকোর নীচে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির সামনে চিন্তিতমুখে কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডক্টর সোম। বন্ধ সদর দরজাটা খুলে একটু বাদে বাইরে বেরিয়ে এল যমন। ওর সঙ্গে এক যুবতি, যার মুখ দেখে আমার

মনে হল ভীষণ চেনা। কে হতে পারে? সুকন্যার সঙ্গে তো একটু আগেই রঘু নায়েকের নেশাঘরে দেখা হল। মানে মৎস্যকন্যার সঙ্গে। এ তাহলে কে?

পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল ফোনটা বার করে আর একবার দেখে নিলাম ঠিকঠাক সুইচড অফ আছে কিনা।

আছে।

অনেকটা পথ ঘুরে, মহান্ত নিবাসের বাউন্ডারি ওয়ালকে এড়িয়ে একটা বালির টিলার ওপরে গুছিয়ে বসলাম। জায়গাটায় ঝাউগাছের ছায়া আছে। ঠান্ডা হাওয়া আছে। এখানে বসে অনন্তকাল অপেক্ষা করা যায়।

অপেক্ষাই করছিলাম। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল। চাঁদ উঠল। সেই মহিলা, যমন আর ডক্টর সোম যে কতবার মহান্ত নিবাসের ঘর বার করলেন তা গুনে উঠতে পারলাম না।

মাঝেমাঝেই চোখের সামনে থেকে ওরা সবাই মুছে যাচ্ছিল। তার বদলে ভেসে উঠছিল একটা গোলবারান্দা। সেখানে এলো চুল মেলে দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল মৎস্যকন্যা। তার অক্ষত শরীর। পাশে রেলিং-এর ওপরে চিবুক রেখে ছোট্ট যমন। কাকের মুখে ছুড়ে দিচ্ছে উড়তে শেখেনি যে চড়াইপাখির ছানা, তাকে।

কোথাও কোনো ডাক্তার ছিল না, পুরোহিতও নয়। শুধু অলৌকিক চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল অলৌকিক শহর —গুঞ্জাবালু।

অনেক রাতের দিকে হঠাৎ খেয়াল করলাম, প্রচুর মানুষ মহান্ত নিবাসের সামনে জড়ো হয়েছে। ওদের প্রত্যেকের হাতেই কোনো না কোনো একটা আলো —সে টর্চলাইট হোক কিংবা লণ্ঠন, মশাল কিংবা সোলার ল্যাম্প। একটা আলোর শেকল ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

বালিয়াড়ি-র ঢাল বেয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে আমি নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললাম —যাব না। কক্ষনো ছেড়ে যাব না।

পা ডুবে গেল জলে। নোনা জলের ছিটে লাগল মুখে। আরও গভীরে নেমে যেতে যেতে বললাম, মৎস্যকন্যার কাছেই থাকব।

পাম্পঘর



বিয়ের পর তারক নতুন বউকে নিয়ে যে-ঘরটায় সংসার পাতল সেটা আসলে একটা বন্ধ কারখানার কেয়ারটেকারের ঘর। কারখানা যখন চালু ছিল, তখন ওই ঘরে দ্বারভাঙার ভূমিপুত্র, কেয়ারটেকার কুন্দন সিং তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকত। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও সে বছর-দুয়েক ওই ঘরে ছিল, একাই। তারপর যখন সে দেখল টিনা-বস্তির চোরচামারগুলো কারখানার বাতিল মেশিন-পত্র সবই এক এক করে খুলে নিয়ে চলে গেল, এমনকি শেডের টিনগুলো অবধি বাকি রাখল না, আর তাই নিয়ে মালিকপক্ষেরও কোনো হেলদোল নেই, তখন কুন্দন সিং নিজেও মুলুকে ফিরে গেল। ওখানে তার খেতি-জমি আছে। বাকি জীবনটা চাষবাস করে খাবে। যাবার আগে তারককে ঘরটায় বসিয়ে দিয়ে গেল।

তারক মাইতির সঙ্গে কারখানাটার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এন্টালি-বাজারে তার একটা ছোটো দর্জির দোকান আছে। এতদিন অবধি সে রাতে ওই দোকানের মধ্যেই শুতো আর ফুটপাথের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করত। এন্টালি-বাজারেরই আর এক দোকানদার হারাধনের উদ্যোগে হারাধনের দিদির ননদের মেয়ে কাবেরীর সঙ্গে তারকের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকেই তারক যে সমস্যাটা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, সেটা হল, বউকে নিয়ে থাকবে কোথায়? বিয়ে করলে তো কাবেরী তাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে চাইবে। তার জন্যে রান্নার জায়গা চাই। ভাব-ভালোবাসার জন্যে আব্রুওলা একটা শোয়ার ঘর চাই। পরে বাচ্চাকাচ্চা হলে তাদের খেলে বেড়াবার জায়গাও দরকার হবে। এন্টালি-মার্কেটের ওই আট বাই পাঁচ দোকানঘরে তো এসব কিছুই হবে না।

তখন তারক যাকে সামনে পেত তাকেই বলত, সস্তায় একটা ঘর দেখে দিন না স্যার! দাও না দাদা! দে না ভাই!

লোকজন ঘরের খবর দিচ্ছিলও মাঝেমধ্যে। কিন্তু হয় সেসব ঘরের ভাড়া ছিল তারকের সাধ্যের বাইরে আর না হলে এমন লোকালিটিতে ঘর যে, সেখানে বউ নিয়ে থাকা যায় না।

কুন্দন সিং ছিল তারকের বাঁধা কাস্টমার। কুন্দন নিজে যদিও ডিউটির সময় কারখানার খাকি ইউনিফর্ম আর অফটাইমে ধুতির বাইরে কিছু পরত না, তবু বেশ কয়েকবছর ধরে ওর ছেলেমেয়ে আর ঘরওয়ালির জামাকাপড় তারকই বানিয়ে দিয়ে আসছিল। সেই কুন্দন সিংই ওর হাতে স্বর্গ ধরিয়ে দিল। বলল, তুমি এক কাজ করো। আমি তো দেশে চলে যাচ্ছি। তুমি আমার কোয়ার্টারটাতেই থাকো।

তারক ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, ভাড়া কেমন কিছু...?

কুন্দন সিং মাছি তাড়ানোর মতন করে হাত নাড়িয়ে বলল, ভাড়াটাড়া লাগবে না। কোর্টে চারজন পার্টনারের আটখানা মামলা ঝুলছে। কে নেবে তোমার কিরায়া? আর তা ছাড়া এমনিতেই ও বাড়ি দুদিন বাদে ভেঙে পড়ে যাবে। একবার শুধু আমার সঙ্গে বেলেঘাটার অফিসে যাবে। আমি আমার জায়গায় তোমার নামটা নতুন কেয়ারটেকার হিসেবে এন্ট্রি করে দেবো। মাইনে-টাইনে চেয়ে বোসো না যেন।

তারক পারলে তখন মার্কেটের রাস্তার ওপরেই ডিগবাজি খায়। হা হা করে উঠল —না না সিংজি। মাইনের দরকার নেই। কিছুদিন একটা মাথা গোঁজার আস্তানা পেলেই অনেক। তার মধ্যে আমি একটা বেটার জায়গা খুঁজে নিতে পারব।

তো সেই চুক্তিতেই তারক মাইতি তার নতুন বউ, গোত্রান্তরের আগে যার নাম ছিল কাবেরী হালদার, অধুনা কাবেরী মাইতি, তাকে নিয়ে বন্ধ গ্লাস ফ্যাক্টরির কেয়ারটেকারের ঘরে সংসার পাতল।

*****

বিয়ের আগের কয়েকদিনে তারক কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ঘরটাকে একটু সাফসুতরো করে রেখেছিল। সে পরিশ্রমী ছেলে, বয়েস মাত্র ছাব্বিশ। তাই ওই কাজটা সে নিজের হাতেই করেছিল। আর তা ছাড়া একজন মজুর লাগাতে গেলে কিছু না হোক দুশো-টাকা খরচা আছে। অত

বাবুগিরি করার মতন অবস্থা তারকের নেই।

জীবনে প্রথমবার কারখানাটার ভেতরে ঢুকে মনটা বেশ দমে গিয়েছিল তারকের। পটারি-রোডের ওপরে বিশাল লোহার গেট। তার গায়ে আবার একটা ছোটো পাল্লা। মেন-গেটে শক্তপোক্ত তালা লাগানো রয়েছে, তবে ছোটো পাল্লাটা খোলাই থাকে। ওটা দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। মানে ভদ্রলোকেরা ওটা দিয়েই যাতায়াত করে। চোরেরা বড়োবড়ো মালপত্র নিয়ে ভাগবার জন্যে পেছনের পাঁচিলের অনেকটা জায়গা সুবিধেমতন ভেঙে নিয়েছে।

সামনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা বড়ো শেড। দেয়াল আর ছাদের টিনের পাতগুলো প্রায় সবই চুরি হয়ে গেছে। এখন অবশিষ্ট রয়েছে কেবল লোহার বিমগুলো। নেহাত চোরেদের সাধ্য হয়নি ওগুলো কেটে নিয়ে যায়, তাই রয়ে গেছে। এটা ছিল মূল কারখানা। খুব ভালো-কোয়ালিটির সেরামিকের বাসনপত্র তৈরি হত এই কারখানায়। গত কয়েকবছরে সস্তার চাইনিজ মালের সঙ্গে কম্পিটিশনে হেরে গিয়ে ব্যাবসাটা বন্ধ হয়ে গেল।

কারখানা-ঘরের পাশেই আর একটা ইট-সিমেন্টের পাকা গাঁথনির ঘর। ওটা ছিল গোডাউন। ওই ঘরটার ছাদ-দেয়াল ইত্যাদি আস্তই রয়েছে, শুধু লরি ঢুকবার মতন করে বানানো বড়ো কাঠের দরজাটা হাট করে খোলা। বোঝাই যায়, ভেতরের মালপত্র সরানোর জন্যেই দরজার পাল্লাদুটো ভাঙা হয়েছিল।

এই দুটো ঘরের পেছনে প্রায় দু-বিঘে খালি জমি। কারখানাটা যখন চালু ছিল তখন ওই জমিটা লরির স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করা হত। এখন পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মামলা-টামলা মিটে গেলে নিশ্চয়ই চমৎকার একটা হাউসিং-কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে ওখানে। আপাতত দু-বছরের বর্ষায় পুরো চত্বরটা জুড়ে নানারকমের জংলা-গাছ গজিয়ে উঠেছে। কারখানার দেয়ালের গায়েও ছড়িয়ে পড়েছে বট-অশথের শেকড়। পায়ের নিচে ঘন ঘাসের জঙ্গল। কালকাসুন্দে, পুটুশ ইত্যাদির ঝোপও রয়েছে। প্রথমবার ভেতরে পা দিয়েই তারকের মনে যে-চিন্তাটা এসেছিল, সেটা হল, ওর বউ এখানে থাকলে রেপ্‌ড হয়ে যাবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। আর একা তো থাকতেই হবে। তারক তো বেশির ভাগ সময় দোকানেই পড়ে থাকে।

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা কারখানা আর গোডাউনকে বেড় দিয়ে পেছনের দিকে চলে গিয়েছিল। ওই রাস্তাটার ওপরে এখনও জঙ্গল ঘন হয়ে ওঠেনি, কারণ, কদিন আগে অবধি ওই রাস্তাটা ধরেই কুন্দন সিং যাতায়াত করত। ওই রাস্তা ধরেই তারকও কম্পাউন্ডের পেছনদিকে পৌঁছোল এবং কোয়ার্টারটা দেখে বুঝতে পারল, ও মিথ্যেই ভয় পেয়েছিল। কোয়ার্টারটা যেন একটা ছোটোখাটো দুর্গ। বাইরের পাঁচিলের ভেতরে ওরকমই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা দু-কামরার বাড়ি। পাঁচিলের মাথায় ধারালো কাঁটাতারের বুনোট, গায়ে লোহার শিট দিয়ে তৈরি একটা একপাল্লার দরজা। ওই দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলে কারুর সাধ্য নেই বাড়ির উঠোনে পা রাখে।

কুন্দন সিং-এর দিয়ে যাওয়া চাবি দিয়ে লোহার দরজার তালা খুলে তারক কোয়ার্টারের হাতায় পা রেখেছিল। নজরে পড়েছিল, কোয়ার্টারের বারান্দাটাও গ্রিল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘেরা। তার গায়ে আবার একটা দরজা। এইসবই নিশ্চয়ই কুন্দন সিং-এর ব্যবস্থাপনায় তৈরি। ওকেও তো মেয়ে-বউ নিয়ে এখানে থাকতে হত।

গ্রিলের গেট খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই তারকের মনটা বেজায় খুশি হয়ে উঠেছিল। পুরোনো আমলের কোয়ার্টারটা সত্যিই সুন্দর। দুটো বড়ো-বড়ো ঘর। আলাদা বাথরুম। আলাদা রান্নাঘর। আবার পেছনের দিকে একফালি বারান্দাও রয়েছে। এরকম বাড়িতে তার চোদ্দোপুরুষে কেউ কখনও থাকেনি।

পেছনদিকের শানবাঁধানো উঠোনের এক কোণে একটা তালাবন্ধ চৌকো ঘর। তারকের মনে পড়ে গেল, কুন্দন সিং তাকে বলেছিল, পাম্পঘরটা কোয়ার্টারের পেছনেই রয়েছে। এও বলেছিল সপ্তাহে একবার মিনিট-পনেরো পাম্পটা চালিয়ে নিতে। কারণ আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারে কর্পোরেশনের যে জল এসে জমা হয়, ওই পাম্পটাই সেটাকে ছাদের ওপরের ট্যাঙ্কিতে তোলে। তাতেই স্নান থেকে রান্না সব কিছু। আগে অন্য স্টাফেদেরও কাজে লাগত সেই জল। তখন প্রতিদিন আধঘণ্টা করে পাম্প চালাতে হত। এখন তো শুধু তারকরা দুজন। সপ্তাহে পনেরো-মিনিটই যথেষ্ট।

তো শ্রাবণ-মাসের এক সন্ধেবেলায় তারক মাইতি তার বউ কাবেরীকে রিকশায় চাপিয়ে ওই কোয়ার্টারে এসে উঠল। কাবেরী

সামনে-সামনে টর্চ দেখিয়ে কারখানার পোড়ো-জমিটা পেরোল। তার পেছন-পেছন তারক আর রিকশাওয়ালা দুটো দুটো চারটে সুটকেস নিয়ে কোয়ার্টারের বারান্দায় উঠে হাঁফ ছাড়ল। এর জন্যে রিকশাওলাটাকে কুড়িটাকা বাড়তি দিতে হল, উপরন্তু তারককে আবার তাকে টর্চ দেখিয়ে গেট অবধি পৌঁছেও দিয়ে আসতে হল। সে ব্যাটা কিছুতেই ফেরার পথে সাপের কামড়ে মরতে রাজি হচ্ছিল না।

*****

কাবেরী মেয়েটার বয়স কম। কুড়ি-একুশের বেশি হবে না। ছোটোখাটো চেহারা, গায়ের রং ফরসাই বলা চলে। নাক-চোখ তেমন কিছু নয়, কিন্তু ঠোঁটের কাছটা ভারি সুন্দর। তারক মাইতি মেয়ে দেখতে গিয়ে ওই ঠোঁটের প্রেমেই পড়েছিল।

বাবা মারা যাবার পর থেকে কাবেরী মায়ের সঙ্গে মামার সংসারে গলগ্রহ হয়ে পড়েছিল। বেশিদিন মামাবাড়িতে কাটাতে হয়নি অবশ্য... এই বছর তিনেক। তার মধ্যেই মামি ওর বিয়ে দেওয়ার জন্যে মামার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। যাই হোক, মামির তাগাদাতেই সাত তাড়াতাড়ি তারকের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে গেল।

মা আর মামা এমন গাঞ-গোত্রহীন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটু আপত্তি করেছিল বটে। কিন্তু তার উত্তরে মামি যখন ঝাঁইঝাঁই করে বলতে শুরু করল — আপনাদের মেয়েই বা কী পদের? ওরও তো মাথার অসুখ আছে, যখন-তখন সুইসাইড করতে যায় – তখন ওই এক কথাতেই মা আর মামাবাবু মামির ভাইয়ের নিয়ে আসা সম্বন্ধটা সুড়সুড় করে মেনে নিল।

মামি যে বলেছিল, কাবেরী যখন-তখন সুইসাইড করতে যায়, সে-কথাটা ঠিক নয়। সে একটা কুড়িবছরের তরতাজা মেয়ে। ফুচকা খেতে ভালোবাসে, সিনেমা দেখতে যায়, মেলায় জাঙ্ক-জুয়েলারি কিনতে ভালোবাসে। বাবা মারা যাওয়ার আগে ক্লাস ইলেভেন অবধি পড়াশোনাও করে ফেলেছিল। সে কেন সুইসাইড করতে যাবে?

আসলে যেটা হয়, কাবেরীর চোখের সামনে থেকে মাঝেমাঝে বাস্তবের পৃথিবীটা মুছে যায়। ও সম্পূর্ণ অন্য একটা দৃশ্যপটের মধ্যে

গিয়ে পড়ে। তখন ও কী যে করে, কোথায় যে যায়, সেসব কিছুই ওর হাতে থাকে না। এই অবস্থাটা খুব বেশিক্ষণ থাকে না — বড়োজোর পাঁচমিনিট। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই কয়েকবার সে বেভুল অবস্থায় বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল।

একবার যেমন এক ভদ্রলোক তাকে শেষ-মুহূর্তে হাত ধরে টেনে রেল-লাইনের ওপর থেকে সরিয়ে না আনলে, সে রানিং-ট্রেনের নীচে কচুকাটা হয়ে যেত। বিয়ের মাত্র দু-মাস আগে মামি নিজে হঠাৎ নীচের উঠোনে কাপড় মেলতে গিয়ে দেখে, ন্যাড়া ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে কাবেরী টাল খাচ্ছে। সেদিন মামি অসাধারণ মনের জোরে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে পেছন থেকে টান দিয়ে কাবেরীকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল।

মামির ধারণা, ও স্বেচ্ছায় ট্রেনে গলা দিতে গিয়েছিল আর ছাদ থেকে ঝাঁপ দিচ্ছিল। সোজা-বাংলায় সুইসাইড করতে গিয়েছিল কাবেরী।

মা বা মামার ধারণাটাও খুব একটা অন্যরকম কিছু ছিল না। কেমন করেই বা থাকবে? চোখের সামনে থেকে পৃথিবী মুছে যাচ্ছে, অথচ সেই মেয়ে তখনও ভিড়টিড় বাঁচিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে —এটা তো কাউকে বিশ্বাস করানো যায় না।

মামি ওকে নিয়ে গিয়েছিল পাড়ার এক বৃদ্ধ ডাক্তারের কাছে আর মা নিয়ে গিয়েছিল মনসা-বাড়ির পূজারির কাছে। পূজারি বলেছিলেন এটা একধরনের ভর আর ডাক্তারবাবু বলেছিলেন একধরনের মৃগী রোগ। তবে দুজনেই একই উপদেশ দিয়েছিলেন —এই মেয়ের বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। ডাক্তারবাবু কাবেরীকে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে মামিকে একটু বিশদেই বুঝিয়েছিলেন —বোঝেনই তো যৌন-উপবাস বড়ো খারাপ জিনিস। যাকে বলে 'সেক্স-স্টার্ভেশন'। কখন যে তার কেমন বহিঃপ্রকাশ হবে বলা মুশকিল। কাবেরী ডাক্তারবাবুর চেম্বারের পাতলা প্লাইবোর্ডের পার্টিশনের ওপাশে দাঁড়িয়ে সবটাই শুনেছিল। তবে ভালো বুঝতে পারেনি। মামি পুরোটাই বুঝেছিল এবং প্রমাদ গুনেছিল, যার ফলশ্রুতিতে তার ঠিক দু-মাসের মাথায় কাবেরীর বিয়ে হয়ে গেল।

কাবেরী খুব শান্ত মেয়ে। গরিবের মেয়ের যেমন হয়, জীবন নিয়ে তার খুব উচ্চাশা ছিল না। বর তাকে ভালোবাসবে, দু-বেলা ডাল-ভাতের ওপরে একটু মাছ জুটবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারবে

—এইসব সাদামাঠা স্বপ্ন নিয়েই সে সপ্তপদীতে হেঁটেছিল। তারককে তার খুবই পছন্দ হয়েছে। একটু বেঁটে হলেও তারকের স্বাস্থ্য ভালো। করিতকর্মা তো বটেই, না হলে কলকাতা শহরে করে খাচ্ছে?

কাবেরীর যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সেটা হল ওর উচ্চাশা। বিয়ের পরের এই একটা সপ্তাহে তারক কাবেরীকে গল্পে-গল্পে বলেছে তার নানান প্ল্যান-প্রোগ্রামের কথা। যেমন এই দর্জির দোকানটাকেই সে আরও বড়ো করে তুলবে। অন্তত দুজন কর্মচারী রাখবে। এমনকি স্যুটের কাটিং শিখবার জন্যে সে যে ধর্মতলার এক ওস্তাগরের কাছে দৌড়োদৌড়ি করছে, সেটাও কাবেরীকে বলেছিল তারক। কাবেরী সব কিছু শুনে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তারককে বলেছিল, আমাকে কখন কী করতে হবে বোলো। আমি তো জানি না কিছু।

তারক দু-হাতের মধ্যে কাবেরীর মুখটা ধরে বলেছিল, কিচ্ছু ভেবো না। তুমি আগে আমাদের সংসারটা গুছিয়ে নাও। তারপরে বাইরের কাজে আমার সঙ্গে হাত লাগিয়ো।

*****

কেয়ারটেকারের ঘরে সেটল করার পরেরদিন তারক সকাল সাড়ে-নটা নাগাদ বেরিয়ে গেল এন্টালি বাজারে ওর টেলরিং-শপ খুলতে। এমনিতেই কদিন দোকান বন্ধ ছিল। আর বেশিদিন বন্ধ থাকলে পুজোর চাপ সামলাতে পারবে না। আজকাল বর্ষাকাল শেষ হতে না হতেই লোকে পুজোর জামাপ্যান্ট বানাতে দিতে শুরু করে।

তারককে বেরোনোর সময় রুটি-তরকারি করে খাইয়েছিল কাবেরী। তারক বলে গেছে দুপুর আড়াইটের সময় ভাত খাওয়ার জন্যে ও বাড়িতে ফিরবে। মাঝের পাঁচটা ঘণ্টা বাড়িতে রইল কাবেরী একা। তাতে ওর কোনো অসুবিধে ছিল না। চারিদিকে জঙ্গল ঠিকই, কিন্তু জায়গাটা তো আদতে শহর কলকাতা। কান পাতলে দিব্যি গাড়ির হর্ন, মাইকের আওয়াজ সবই শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া অত উঁচু পাচিলের মধ্যে রয়েছে। ভয় কীসের? বরং সময় কাটানোটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দুপুরের রান্না, সে তো একঘণ্টার মধ্যেই সারা হয়ে গেল। এবার কেমন করে সময় কাটে?

কাবেরী পাঁচিলের গায়ের লোহার দরজায় ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে উঠোনে নামল। সামনের দিকটায় এককালে ফুলের গাছ ছিল। এখন সেগুলো শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে। কাবেরী ঠিক করল, এখানে সে আবার বাগান করবে। তারপর কাবেরী গেল বাড়ির পেছনদিকটায়। আর তখনই তার চোখে পড়ল পাম্পঘরটা।

হলুদ এলা-রঙে রাঙানো একটা চারচৌকো ছোটো ঘর। একটাই দরজা। জানলা নেই। দরজার কড়ায় মরচে পড়া একটা তালা ঝুলছে। ছাদের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে একটা পেয়ারাগাছের ডাল। আর একদিক থেকে লতিয়ে উঠেছে একটা কুমড়োর লতা। এই ঘরটা কাবেরীর ভীষণ চেনা। ওই পেয়ারার ডাল, কুমড়োলতা সবই সে এর আগে অনেকবার দেখেছে। সে মনে-মনে জানত ঘরটার পেছনের দেয়ালে সাপের চেরা-জিভের মতন একটা ফাটল দেখতে পাবে। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে কাবেরী দেখল, ঠিক তাই। ফাটল-টা রয়েছে।

এই ঘরটাকেই প্রত্যেকবার কাবেরী তার ঘোরের মধ্যে দেখেছে। এমনকি পরে ভাবতে গিয়ে তার মনে হয়েছে, সে প্রত্যেকবার স্বপ্নের মধ্যে ওই পাম্পঘরটার দিকেই যেতে চাইছিল। ঘরটাই তাকে ডেকেছিল।

কাবেরী দেয়ালের ফাটলটার ওপর দিয়ে একবার আঙুল বুলিয়ে আনতেই বন্ধ পাম্পঘরের ভেতরে একটা মৃদু গুঞ্জরন শুরু হল।

কাবেরী তার সাজানো দাঁতের সারির ফাঁকে ছোট্ট সুন্দর ঠোঁটদুটোকে কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ সেই শব্দটা শুনল। তারপর ফিসফিস করে বলল, আজ নয়, কাল। চাবি নিয়ে আসতে হবে।

দীর্ঘশ্বাসের মতন একটা ফোঁস শব্দ উঠল। গুনগুনানি থেমে গেল।

*****

কাবেরী আর তারক যে-ঘরটায় শুতো, সেটারই দেয়ালের পেরেকে দশ-বারোটা চাবির গোছা ঝোলানো থাকত। স্বাভাবিক, ঘরটা যেহেতু কেয়ারটেকারের। পরের দিন তারক বেরিয়ে যাওয়ামাত্র কাবেরী ওর মধ্যে থেকে আন্দাজ-মতন কয়েকটা চাবি নিয়ে পাম্পঘরের দিকে চলে গেল। কয়েকবার চেষ্টার পরে একটা চাবিতে পাম্পঘরের দরজার মরচেধরা তালাটা খুলে গেল। কাবেরী ঘরটার ভেতরে পা দিতেই ওর

পেছনে দরজাদুটো নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কাবেরী কপট-রাগে ঠোঁট মুচড়ে বলল —চিরকালের অসভ্য!

বহুকালের পুরোনো পাম্পমেশিনটা ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা সিমেন্টের ফাউন্ডেশনের ওপরে গাঁথা ছিল। বন্ধ দরজার পাল্লার গায়ে একটা-দুটো ফুটোর মধ্যে দিয়ে যেটুকু আলো এসে ঘরের ভেতরে ঢুকছিল, তাতে মনে হচ্ছিল এক পেশল মানুষ হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মেঝের ওপরে বসে আছে। কাবেরী মুগ্ধ চোখে মেশিনটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে আলতো হাতে মেশিনটার কাঁধের কাছে হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেউ ফিসফিস করে কথা বলে উঠল। হতে পারে সেটা বাইরের পেয়ারাগাছটারই পাতার শিরশিরানি। হতে পারে ঘুলঘুলির মধ্যে চড়াইপাখিদের বাসা বাঁধার শব্দ।

দরজার ফুটোর ভেতর থেকে আসা আলোর রেখা মেঝের ওপরে পশ্চিম থেকে পুবে সরে-সরে যাচ্ছিল। রোদের রং রুপোলি থেকে হলুদ হয়ে আসছিল। কতক্ষণ বাদে কাবেরী যখন পাম্পঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল তখন ওর গলা, মুখ, কপাল সব ঘামে ভেসে যাচ্ছে।

দোকান থেকে ফিরে এসে তারক দেখল, বারান্দার গ্রিলের গেট, লোহার দরজা কিছুই বন্ধ না করে কাবেরী ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক দিতেই কাবেরী ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, ইশশ্! কেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দেখো। আমার যে রান্না হয়নি এখনও। কী হবে?

তারক আলতো হাতে তার নতুন বউকে জড়িয়ে ধরে বলল, কিচ্ছু হবে না। স্টোভে ডিমভাতে আলুভাতে বসিয়ে দিয়ে এঘরে চলে এসো। এতক্ষণ তোমার মুখটা না দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। একটু প্রাণভরে দেখি তোমাকে।

কাবেরী বলল, এখন আর মুখ দেখতে হবে না। আগে চান করে এসো।

কাবেরীর কথায় তারক একটু দুঃখ পেল। বউয়ের কি তাকে পছন্দ হচ্ছে না? খাওয়া-দাওয়ার পরে তারক সেই অভিমানেই কাবেরীকে খাটের ওপরে ঠেসে ধরে তার সালোয়ারের দড়ির দিকে হাত বাড়াতেই কাবেরী উঁহু উঁহু করে উঠল। তারক থতোমতো খেয়ে বলল, কী হল?

শুরু হয়ে গেছে। এখন ওসব বন্ধ।

কী শুরু হয়ে গেছে?

আহা ন্যাকা! জানে না যেন! মেয়েদের প্রতিমাসে পাঁচদিন শরীর খারাপ হয় জানো না? কামিজটাকে যথাস্থানে টেনে নামিয়ে নিতে-নিতে তারকের কাছ থেকে একটু সরে শুলো কাবেরী। ঘুমিয়েও পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বিমর্ষ তারক কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, সাইকেল চালিয়ে চলে গেল তার দোকান খুলতে। যাবার আগে বারান্দার গ্রিলের দরজায় টিপতালাটা লাগিয়ে দিয়ে গেল। এই তালাটার চাবির একটা কপি তার কাছে থাকে আর একটা কপি বাড়িতে, কাবেরীর কাছে।

দোকান বন্ধ করে রাত নটায় বাড়ি ফিরল তারক। লোহার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের বেল বাজাতেই কাবেরী তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে খিল খুলে বেরিয়ে এল। তারপর আকুল হয়ে তারককে জড়িয়ে ধরল। তারক বুঝতে পারছিল, কান্না চাপার চেষ্টায় ওর শরীরটা কাঁপছে। দুহাতে কাবেরীকে জড়িয়ে ধরে তারক জিজ্ঞেস করল, কী হল সোনা? ভয় পেয়েছ?

কাবেরী যেমন তারকের বুকে মুখ গুঁজে ছিল, সেইভাবে মুখ না তুলেই বলল, হুঁ।

কীসের ভয়? ভূতের? না চোরের?

কাবেরী কোনো উত্তর দিল না।

তারক যেন একটা বাচ্চা মেয়েকে বোঝাচ্ছে এইভাবে বলল, ভয় পেয়ো না। এই কারখানা থেকে যা-যা লুঠ করার মতন ছিল, সব অনেক আগেই লুঠ হয়ে গেছে। চোরেরা আর আসবে কেন? আর তা ছাড়া কারখানার বাইরেই কেমন জমজমাট বাজার দেখেছ তো? ভূতটুতও এর ত্রিসীমানায় ঢুকবে না।

কাবেরী হঠাৎ মুখটা তুলে বলল, চলো। ভেতরে চলো। কিচ্ছু হয়নি আমার। জানো তো। আজ তোমার জন্যে একটা নতুন জিনিস রান্না করেছি। কী বলো তো! চিংড়িপোস্ত। তুমি খেয়েছ কখনও?

তারকের কেন যেন মনে হল, কাবেরী একটু বেশিই উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে। তবু ওদের দুজনেরই যা বয়স, তাতে আনন্দ সংক্রামিত হতে সময় লাগে না। চমৎকার খাওয়া-দাওয়া হল সেই রাতে।

তার পরে যা হল, তা আরও চমৎকার। ঘরের আলো নেভানোর পরে

কাবেরী নিজেই পাগলের মতন নিজের শরীরে ডেকে নিল তারককে। ভেসে যাওয়ার আগে তারক একবার শুধু অবাক-গলায় বলতে পেরেছিল, কিন্তু তুমি যে দুপুরে বললে শরীর খারাপ।

ওরকম ভুল হয় মাঝেমাঝে। তুমি ব্যাটাছেলে, সব কথা জানতে হবে না। দুই উরুর মধ্যে তারককে জড়িয়ে নিয়ে উত্তর দিল কাবেরী।

রতিতৃপ্ত তারক ঘুমে ডুবে যাবার সময় স্বপ্নেও ভাবেনি, সেই ঘুম ভাঙার পরে এমন চরম বিস্ময়, তীব্র ঘৃণা আর অসহায় অভিমানের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে তাকে। কিন্তু তা-ই হল।

তারকের বরাবরই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস। যারা একলা বড়ো হয় তাদের সাধারণত একার হাতে কাজ সারার জন্যেই ভোরে ওঠার অভ্যেস তৈরি হয়ে যায়। কাবেরী ওঠে একটু দেরিতে। সেদিনও তারক ঘুম ভাঙার পরে দেখল একমুঠো জুঁইফুলের মতন কাবেরী তার পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে। গতরাতের রতিক্রিয়ার পরে কাবেরী শাড়িটা আলতো করে গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন সেই শাড়ি উরুর ওপরে উঠে গেছে। ভোরের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাবেরীর দুটো উরুরই ফরসা চামড়ার ওপরে ছোটোছোটো সমান্তরাল কয়েকটা দাগ। রক্ত জমে আছে। দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো দাঁতের দাগ। দুটো... চারটে... ছটা।

না, তারকের প্রেম এমন উন্মাদ নয়।

তাহলে উরুতে কার দংশনক্ষত নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে তার বউ? এই দাগগুলো লুকোনোর জন্যেই কি আজ দিনের আলোয় সংগমে সম্মতি দেয়নি কাবেরী? নিশ্চয়ই তাই।

সেদিন দোকানে বেরোনোর আগে তারক বলে গেল, আজ আর দুপুরে খেতে আসব না, বুঝলে। একটু কাজের চাপ রয়েছে।

*****

তারক বেরিয়ে যাওয়ার পরে কাবেরী পাম্পঘরে ঢুকল। শাড়ি সায়া খুলে একদিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, কী অবস্থা করেছ, দেখো। জন্তু কোথাকার! এইভাবে কেউ কামড়ায়? আমি ওর কাছে লুকোব কেমন করে?

পুরোনো পাম্প-মেশিনটার বুকের অনেক গভীর থেকে আশ্লেষের গুরগুর শব্দ বের হল। একটা লোহার নিপলের ভেতর থেকে ভলকে-

ভলকে বেরিয়ে এল গেরুয়া রঙের মরচে-গোলা জল। কাবেরী নগ্ন-শরীরে পাম্প-মেশিনটাকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, কষ্ট পাচ্ছিলে খুব, তাই না? সেইজন্যেই অমন করে স্বপ্নের মধ্যে ডাকতে আমাকে?

ভাঙাচোরা লোহার খোলের ভেতর থেকে একটা রাবারের সাকশন-পাইপ উঠে এসে কাবেরীর ঠোঁটদুটোর ওপরে চেপে বসল। কাবেরী চোখ বুজল। কিছুক্ষণ বাদে সাকশন-পাইপটা নিজের জায়গায় ফিরে গেল। পাম্পের লোহার শরীরের নীচে, সিমেন্টের বেদির মাঝখানের ফাঁকটুকুতে নিজের ছোটোখাটো শরীরটাকে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল কাবেরী। পাম্পটা একটু নেমে এসে চেপে বসল তার শরীরের ওপরে।

তারক জীবনে খুব বেশি মিথ্যে কথা বলেনি। সেদিন বলেছিল। সেদিনও সে প্রতিদিনের মতন দুপুরেই বাড়ি ফিরে এল। বরং যে-সময়ে ফেরে তার চেয়ে একটু আগেই।

কারখানার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই সাইকেল থেকে নেমে পড়ল তারক। খুব সাবধানে, একটুও শব্দ না হয় এইভাবে সাইকেলটাকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলল ঘরের দিকে।

লোহার দরজাটায় টোকা মারতে গিয়েই বুঝতে পারল, দরজাটা খোলাই রয়েছে। ভেতর থেকে খিল লাগানো নেই। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলেই তারক উঠোন পেরিয়ে দৌড়ে গেল ঘরের দিকে। কী আশ্চর্য! গ্রিলের গেটটাও তো হাট-খোলা। কাবেরী কোথায়? ও কি কারখানার চত্বরে জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে প্রেম করছে? তারকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে একটা আধলা ইট কুড়িয়ে নিয়ে আবার উঠোন পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই শুনশান দুপুরের হাওয়ায় বাড়ির পেছনদিক থেকে ভেসে এল কাবেরীর গলা।

শিকারি বাঘের মতন গুঁড়ি মেরে তারক পেছনের উঠোনে গিয়ে দেখল পাম্পঘরের দরজার তালাটা খোলা অবস্থায় ঝুলছে। পাল্লাদুটো ভেতর থেকে চেপে বন্ধ করা রয়েছে। তারক মনে মনে বলল, শুয়োরের বাচ্চি! আজ তোকে দেখাচ্ছি!

আর সাবধানতার প্রয়োজন নেই। তারক দৌড় লাগাল পাম্পঘরের দিকে আর তখনই লোহার রডের মতন একটা কিছু মাটি থেকে ছিটকে উঠে তারকের বাঁদিকের রগে আঘাত করল।

তারক দেখল পাম্পঘরের মূল পাইপ থেকে এদিক-ওদিক যে সরু নলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, তারই একটা ভাঙা টুকরো সাপের ফণার মতন তার মুখের সামনে দুলছে। তারক সরে দাঁড়াবার আগেই সেই লোহার টুকরোটা আর একবার সপাটে আছড়ে পড়ল তারকের কপালের ঠিক মাঝখানে। সে কপাল চেপে ধরে মনে-মনে নিজেকেই খিস্তি করল। কোথায় পা দিচ্ছি দেখছি না শালা। এই বউটার জন্যেই মরব আমি।

হঠাৎই পাম্পঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কাবেরী। তারককে দেখে অবাক হয়ে বলল, এ কী! তুমি যে বললে দুপুরে আসবে না! শরীর খারাপ হল নাকি?

তাড়াহুড়ো করে পাম্পঘরের দরজায় তালা লাগাতে যাচ্ছিল কাবেরী। তারক কড়া গলায় বলল, দাঁড়াও। চাবিটা আমাকে দাও। আমি বন্ধ করছি।

তালা দেবার আগে তারক অন্ধকার পাম্পঘরের ভেতরে ঢুকে নিজের সেলফোনের আলোয় তন্ন তন্ন করে ঘরটার কোনা-টোনা সব খুঁজে দেখল। না, কোথাও কোনো গোপন প্রেমিক ছিল না।

তারক একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এবার সে কাবেরীকে কী জবাব দেবে? দুপুরে বাড়ি ফেরার পক্ষে কোনোরকমে শরীরখারাপের যুক্তিটাই খাড়া করল তারক।

*****

তবে দাঁতের দাগগুলোর কথা তো অত সহজে ভোলা যায় না। তাই খাওয়া-দাওয়ার পর কাবেরীর পাশে শুয়ে সে সরাসরি প্রশ্ন করল, তোমার দাবনায় ওই দাগগুলো কীসের?

তুমি দেখেছ? চমকে উঠল কাবেরী। কখন দেখলে? আমি নিজেই তো সকালে কাপড় ছাড়ার সময় ওগুলো দেখলাম। কী বিচ্ছিরি না?

তারক কঠিন গলায় বলল, যা জিজ্ঞেস করছি বলো। কীসের দাগ ওগুলো?

কাবেরীর মুখটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল। বলল, ওরকম ভাবে বলছ কেন? চারিদিকে যা জঙ্গল, তার ওপরে এখন বর্ষাকাল। নিশ্চয়ই কোনো পোকামাকড় কামড়েছে।

তারপর হঠাৎই কাবেরী যেন তারকের মনের চিন্তা পড়তে পারল। চোখ বড়ো-বড়ো করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল —তুমি কি... তুমি কি সন্দেহ করছ... ছি ছি ছি! কথা শেষ না করেই দু-হাতে মুখ ঢেকে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাবেরী।

তারকের মাথায় বাজ পড়ল। পোকার কামড়? হ্যাঁ, হতেই তো পারে। তার ইচ্ছে করল নিজের দু-গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারে। তারক বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, কাবেরী জানলার গরাদে কপাল ঠুকতে ঠুকতে আকুল হয়ে কাঁদছে। তারক ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা চাইছি সোনা। ক্ষমা করো আমাকে।

তারপর ওদের ভাব হল।

ভালোবাসা... তাও হল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ দোকানের দিকে রওনা হয়ে গেল তারক। কাবেরী কেমন একটা বেভুল মতন মুখ করে জড়োসড়ো হয়ে বিছানার ওপরে বসে রইল। সে বুঝতে পারছিল না, কেন, কোন দুঃখে সে পাম্পঘরের তালা খুলে ওর মধ্যে ঢুকেছিল! তার বর তো মিথ্যে কথা বলার মানুষ নয়! সে নাকি তাকে পাম্পঘরের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছে। আর তাছাড়া সত্যিই তো, উরুর ওপরে এই দাঁতের দাগের মতন দাগগুলো এল কোথা থেকে। পোকার কামড় হলে তো জ্বালাযন্ত্রণা থাকত। সেসব কিছুই তো সে টের পাচ্ছে না।

সন্ধে নামল। সবে কাবেরী ভাবছে, এবার উঠে চুল-টুল বেঁধে ঠাকুরকে প্রদীপ দেখাবে, এমন সময় সে একটা গন্ধ পেল। খুব চেনা, খুব পরিচিত একটা গন্ধ। মেশিন-অয়েল আর মোবিল মিশলে যে গন্ধটা বেরোয় সেই গন্ধ। যে-জানলাটার পাশে সে বসে ছিল, সেই জানলা দিয়েই অদৃশ্য স্রোতের মতন গন্ধটা ঘরে ঢুকছিল।

হঠাৎ কাবেরীর মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল। সে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার পাল্লাদুটো লাগিয়ে দিল। মনে মনে ভাবল, আজ তারক বাড়ি ফিরলে তাকে বলবে, এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। হাজার হোক, কারখানা হচ্ছে কারখানা আর বাস্তু হচ্ছে বাস্তু। কারখানার মধ্যে সংসার পাতলে কখনও সে সংসারের মঙ্গল হতে পারে?

এরপর যা যা করার সবই করল কাবেরী। গা ধুলো। পুজো করল।

এমনকি কিছুক্ষণ টিভিতে খবর অবধি শুনল। রাত আটটা নাগাদ সে রান্নার জোগাড় করার জন্যে কোয়ার্টারের পেছনের বাঁধানো টিউবওয়েল-তলায় প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে জল ভরতে গেল। জল ভরার পর যখন সে নীচু হয়ে কলের মুখের নীচ থেকে বালতিটা তুলতে গেল, তখনই একটা মোটা গেরুয়া রঙের জলের ধারা তার হাতের ওপরে এসে পড়ল।

বিনা পাম্পে টিউবওয়েল থেকে জল বেরোতে দেখে কাবেরীর নিশ্চয় অবাক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হল না। বরং সে জলের বালতিটা আবার নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সেই জলের ধারা তখনও একটা দিঘল হাতের মতন টিউবওয়েলের মুখ থেকে ঝরে পড়ছিল। কোমরে আঁচলটা জড়াতে জড়াতে সেইদিকে তাকিয়ে কাবেরী বলল, আমি তো একটা সামান্য মেয়ে। এত ভালোবাসো কেন আমাকে?

রাত নটার সময় তারক বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের দরজা খোলা। দুটো ঘরই অন্ধকার। সাইকেলের বেলের শব্দেও কাবেরী বেরিয়ে এল না। তখন তারক ব্যাগ হাতড়ে তার নিজের চাবির কপিটা বার করে গ্রিলের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। দেখল কাবেরী অন্ধকারের মধ্যেই বিছানার ওপর চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের আলো জ্বলার পরে তারক দেখল ঘুমন্ত কাবেরীর ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি। হুক-খোলা ব্লাউজের বাইরে ধবল স্তনের যেটুকু অংশ বেরিয়ে আছে, তার ওপরে কয়েকটা নীল কালশিটের দাগ।

তারক কাবেরীর চুলের মুঠি ধরে ওর মুখটা নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে হিসহিস করে জিজ্ঞেস করল, কে?

ভারী চোখের পাতাদুটো কোনোরকমে একবার খুলে কাবেরী বলল, কোথায় কে? কেউ নেই তো। তারপর আবার ঘুমে ঢলে পড়ল।

তারক কাবেরীর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে অসহায়ের মতন ঘরের চারিদিকে তাকাল। সত্যিই তো, কোথাও কোনো পুরুষমানুষের আসা-যাওয়ার চিহ্ন নেই!

*****

বর্ধমান জেলার একটা এলেবেলে গ্রামের নাম বসুদহ। আসানসোল-রানিগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের ভেতরেই পড়ে এই গ্রামটা। ট্রেনে কিংবা বাসে পাণ্ডবেশ্বর অবধি এসে, আড়াই-কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ভেঙে পৌঁছোতে হয় এই গ্রামে।

গ্রাম বলতে যে শ্যামল সবুজ ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বসুদহ তার ব্যতিক্রম। এখানে গাছের পাতা, মাটির রাস্তা, ঘাসের শিষ, ছাগলের লোম, মুরগির পালক, এমনকি মানুষের চামড়ার ওপরে অবধি একটা ধুলোর মতন মিহি কয়লার আস্তরণ জড়িয়ে থাকে। ফলে শ্যামলতার চিহ্ন নেই কোথাও। কালো... কালো। সবই কালো।

আসলে বসুদহের কাছাকাছি ই.সি.এল-এর যে ওপেন-কাস্ট মাইন-টা ছিল, সেটা বছর-তিনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেছে অবৈধ খাদানের চক্কর। এখন গ্রামের মেয়ে-মরদ সকলেই যেখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠা চোরা-খাদানগুলো থেকে কয়লা কাটছে আর পুরুষেরা সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে কয়লার বস্তা জড়ো করছে পাণ্ডবেশ্বরের লুকোনো গোলায়।

চারিদিকে এই কয়লা কাটার মোচ্ছবেই পুরো গ্রামটা কালো হয়ে গেছে।

বাবা মারা যাওয়ার আগে অবধি এখানেই থাকত কাবেরী। এখান থেকেই সে আর তার মা রানাঘাটের মামাবাড়িতে গিয়ে উঠেছিল।

আজ ভোরের ট্রেনে রানিগঞ্জে এসে নেমেছিল তারক। তারপর বাসে চেপে বেলা এগারোটা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর হয়ে বসুদহে এসে পৌঁছেছিল। এখন বিকেল চারটে। এবার তাকে ফিরতে হবে।

রানাঘাটে যে কাবেরীর গোপন-অগোপন কোনোরকমের প্রেমিকই ছিল না, সে-কথা হারাধন তাকে কসম খেয়ে বলেছে। তার আপন দিদির বাড়িতে যে-মেয়ে ছিল, তার ইন্টুমিন্টুর খবর হারাধন জানবে না এটা তো হয় না। তাহলে বাকি রইল তার আগের জীবনটা —কাবেরীর জীবনের প্রথম সতেরো বছর, যেটা কেটেছিল বসুদহে। এই চিন্তা থেকেই তারক আজ বসুদহে এসেছিল।

এইসব খোঁজ সাধারণত বিয়ের আগেই নিতে হয়। সে নিতে পারেনি। কী করবে? সে সংসারে একা। কে তাকে বুদ্ধি দেবে? কে তার জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরে খবর জোগাড় করবে?

কিন্তু সারাদিন ঘুরেও কাবেরীদের ব্যাপারে কোনো কিছুই জানতে পারেনি তারক। আসলে কাবেরীর বাবা ছিলেন ইস্টার্ন-কোলফিল্ডসের চাকুরে। ওরা বসুদহে থাকত ঠিকই, কিন্তু গ্রামে নয়, কোলিয়ারির টাউনশিপে। মাইন্‌স বন্ধ হয়ে যাবার পরে সেই টাউনশিপ তো এখন ভূতের আস্তানা। গ্রামের লোকেরা ওখানকার বাবুদের খোঁজখবর তখনও রাখত না, এখন তো আরওই রাখে না। কেউ কাবেরীর নামই মনে করতে পারল না।

মনে অশান্তি নিয়েই ফেরার পথ ধরেছিল তারক।

তখন সে সবে পায়ে-হাঁটা পথটায় উঠেছে। একটু জোরে পা চালিয়ে না গেলে পাণ্ডবেশ্বর থেকে রানিগঞ্জ যাওয়ার শেষ বাসটা মিস করবে আর তাহলে কলকাতায় ফেরার ট্রেনও পাবে না। ওদিকে অনেকক্ষণ থেকে আকাশে যে কালো-মেঘটা থম মেরে ছিল, এবার সেটার বুক থেকে কয়েক ফোঁটা ভারী আর ঠান্ডা জল ঝরে পড়ল। তারক মুখ নীচু করে ওর কাঁধের ব্যাগ থেকে ছাতাটা বের করছে, ঠিক সেইসময়েই কে একজন পাশ থেকে ভূতের মতন নাকি-সুরে বলল, সারাদিন ধরে কাবেরী হালদারের সম্বন্ধে খোঁজখবর করছেন দেখছি। আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?

খিদেয়, ক্লান্তিতে এবং সর্বোপরি হতাশায় তারকের মাথাটা জ্বলছিল। সে মুখ না তুলেই উত্তর দিল, না। পারো না।

ওদিক থেকে খুকখুক করে হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপরেই নাকি-গলায় মন্তব্য —না বললেও আন্দাজ করা কঠিন নয়। কাবেরীর প্রেমিককে দেখতে চান?

ততক্ষণে বৃষ্টি বেশ জোরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারক হাতের ছাতাটা খুলতে ভুলে গেল। মুখ তুলে দেখল, একজন বয়স্ক মানুষ। পরণে ছেঁড়া আর নোংরা ধুতি আর ফতুয়া।

তারক বলল, পারবে দেখাতে?

মিনি মাগনা দেখাব কেন? কিছু মালকড়ি ছাড়তে হবে। বুড়োটে লোকটা তারকের সামনে হাত পাতল। চোলাই-মদের গন্ধে তারকের বমি চলে এল। অধৈর্য-গলায় বলল, দেব। আগে দেখাও।

আসুন আমার সঙ্গে।

লোকটার সঙ্গে তারক আবার ফিরে চলল; তবে গ্রামের দিকে নয়। গ্রামের বাইরে দিয়ে যে নালাটা বয়ে চলেছিল, সেটার পাড় বরাবর হাঁটতে শুরু করল লোকটা। পেছন পেছন তারক। বেশ কিছুটা পথ পেরোবার পর লোকটা হঠাৎ মাঠের মধ্যেই একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী হল? তারক জিজ্ঞেস করল।

ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। তারকের চোখের ওপর দিয়ে প্রপাতের মতন জল ঝরে পড়ছিল। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না সে। তবু লোকটার হাতের ইশারা অনুসরণ করে অতিকষ্টে দেখতে পেল টালি দিয়ে ছাওয়া একটা ছোটো চালাঘর।

ওইখানেই রয়েছে। চলুন। লোকটা বলল।

তারক দেখল, চালাঘরটার ঠিক মাঝখানে কুয়োর মতন গভীর গর্ত। গর্তটার এক পাশে শক্তপোক্ত একটা কাঠের মাচা। আর ওটারই গা বেয়ে একটা মোটা পাইপ নীচে নেমে গেছে। কুয়োর গায়ে নীচে নামার জন্যে পর পর লোহার ব্র্যাকেট বসানো আছে। তারক মুখ বাড়িয়ে গর্তের নীচে কালো জলের চিকিমিকি দেখতে পেল।

তারকের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লোকটা বলল, এইটা ছিল আশেপাশের চারটে চোরা-খাদানের পাম্পঘর। মাটির নীচে জল তো জমবেই, বোঝেন না? সে লিগাল মাইনস হোক আর ইললিগাল। সেই জল এখান দিয়ে পাম্প করে তোলা হত। খাদানগুলোর কয়লা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পাম্পটাকেও সরিয়ে নিয়ে গেছে; এই চালাটা পড়ে আছে। ওকে দেখতে চাইলে ধাপ বেয়ে নীচে নেমে যান। তবে প্রায় চারবছর হয়ে গেল তো। এখন দু-একটা হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু পাবেন না।

এটা কী? এর নীচে... মানে কাবেরীর সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক? আর 'হাড়গোড়' মানে? কার হাড়গোড়? তারক বুঝতে পারছিল, কথা বলতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে যাচ্ছে।

লোকটা ফতুয়ার পকেট থেকে প্লাস্টিকে জড়িয়ে-রাখা বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাই বার করল। একটা বিড়ি ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এই পাম্পঘরের কুয়োর মধ্যেই ওরা মঙ্গল সোরেনকে মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। খাপ পঞ্চায়েতের ব্যাপার – বোঝেনই তো। কিছুতেই যখন ছোড়াছুড়ি দুটোকে আলাদা করা গেল না, তখন পাঁচজনে মিলে মঙ্গলকে মেরে ফেলাই ঠিক করল। কই, এবার পয়সাটা দিন।

তারকের বাড়িয়ে দেওয়া পঞ্চাশ টাকার নোটটা বিড়ির প্যাকেটের সঙ্গে প্লাস্টিকে ঢুকিয়ে রেখে লোকটা বলল, চলুন, এবার ফেরা যাক। না হলে বাস পাবেন না। ভালো কথা, কাবেরী এখন কোথায় আছে জানেন নাকি? আমি ছিলাম ওর গানের মাস্টার। ভালো গান গাইত মেয়েটা। মিথ্যে কথা বলব না, আমি ওদের একটু-আধটু হেল্পও করতাম। অনেক সময় আমার বাড়িতে গান শিখতে আসার নাম করেই কাবেরী মঙ্গলের সঙ্গে দেখা করত। সেসব জানতে পেরে আমাকেও এমন পেটাল যে নাকটা পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হয়ে গেল। সেইসঙ্গে গানের গলাটাও গেল। সে আমার যা হয়েছে হয়েছে। মেয়েটা বেঁচে আছে জানতে পারলে ভালো লাগত।

তারক মাথা নাড়ল। তারপর একরকম দৌড়েই ফিরে চলল বাসরাস্তার দিকে।

*****

দোকানঘরের ভেতরে সেলাই মেশিনটার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে ছিল তারক। বাজার বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। এখন মাঝরাত। তার মতন যারা দোকানের ভেতরে রাত কাটায়, তারাও শাটার নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। শুধু তারকই ঘুমোয়নি।

সে নিজের মনে বিড়বিড় করছিল, আমাকে এইভাবে ঠকালে কেন কাবেরী? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম?

সেলাই-মেশিনের চাকাটা নিজে থেকেই একপাক ঘুরে আবার স্থির হয়ে গেল।

তারক কি সেটা খেয়াল করল? কে জানে। সে আবার বলল, একসঙ্গে দুটো মানুষকে কি ভালোবাসা যায়? যায় না বোধহয়। তোমার এটা বোঝা উচিত ছিল।

সেলাই-মেশিনের ছুঁচটা কয়েকবার নামা-ওঠা করল নিজে থেকেই।

তারক খুব ক্লান্ত স্বরে বলল, সবাই আমাকেই দোষী করছে। বলছে, ওই পাম্পঘরের ভেতরে তোর বউকে ঢুকতে দেওয়াই উচিৎ হয়নি তারক। তুই দেখবি না, ভেতরে গ্যাস জমে আছে কিনা। কতকালের বন্ধ ঘর। কার্বন মনোক্সাইড না কী সব যেন বলছিল ওরা। তাতেই নাকি তোমার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তো জানি, ওসব কিছু নয়।

একটু চুপ করে থেকে তারক বলল, আচ্ছা কাবেরী, একটা সত্যিকথা বলো তো। কোনোদিন এই জীবনটাকে ভালোবেসেছিলে? আমাদের এই কয়েকদিনের সংসারটাকে? ভালোবেসেছিলে?

সেলাই-মেশিনের পা-দানিটা থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা চাপা কান্নার মতন আওয়াজ উঠল। তারক আস্তে করে ওর ডানহাতের তর্জনীটা ছুঁচের নীচে ঢুকিয়ে দিতেই ছুঁচটা আঙুলে চুমু খেল। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তারক দেখল, আঙুলের ডগায় একটা রক্তের বিন্দু ক্রমশ ছোটো থেকে বড়ো হয়ে উঠছে।

ইভিল



বেনারসি-বস্তি নামে মাঝারি মাপের গণিকা-পল্লিটিতে একশো-সাঁইত্রিশজন গণিকার বাস ছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল রেণুবালা। সে ঠিক আর পাঁচজনের মতন ছিল না এবং ছিল না বলেই তার কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলতে হচ্ছে।

তার চেহারাটা ছোটোখাটো এবং মুখটা লাবণ্যহীন হলেও গায়ের রং ছিল খুব ফরসা। চোখের মণিদুটো ছিল বেড়ালের মতন, চুলগুলো কটা। এইসব কারণে, হাতকাটা নাইটি পরে যখন সে সন্ধের পর ঘরের দরজায় দাঁড়াত, তখন তাকে বেশ মেমসাহেব-মেমসাহেব দেখতে লাগত। পাড়ায় ওর নামই হয়ে গিয়েছিল 'মেম-রান্ডি'।

রেণুর রেটও ছিল হাই। তবু আশেপাশের লেদ-কারখানার মালিকদের মধ্যে যাদের মনে শ্বেতাঙ্গিনী-সংগমের ফ্যান্টাসি কাজ করত, তারা মাসে একবার হলেও রেণুর ঘরে রাত কাটিয়ে আসত।

'মেম-রান্ডি' নাম বলেই প্রথমবার যারা ওর ঘরে যাচ্ছে তারা রেণুর ভেড়ুয়া নীলকান্তর কাছে ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইত, কাজকর্মের কথা ইংরিজিতে বলতে হবে কি না। নীলকান্ত তাদের আশ্বাস দিয়ে বলত, কোনো প্রশ্নই নেই। রেণুবালা পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। তবে তার চেয়েও বড়ো কথা, খুব প্রয়োজন না পড়লে রেণুবালা বাংলা, হিন্দি কোনো ভাষাতেই কথা বলে না।

তো, এত লোক যার ঘরে ঢুকছে, তার সম্বন্ধে কিছু কেচ্ছা তো বাইরে বেরোবেই। রেণুর খদ্দেররা বলত, ঘরের টিউব-লাইট নেভানোর পর রেণুর পাথুরে মুখটা যে আর তত স্পষ্ট করে দেখা যেত না, সেটা একটা বড়ো বাঁচোয়া। তাতে ওর ফর্সা গতরটাকে হলিউডের কোনো অ্যাকট্রেসের বডি বলে ভেবে নিতে সুবিধে হত। কিন্তু গোল

পাকাত রেণুর চোখদুটো। ওর চোখের সবুজ মণিদুটো নাকি অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বেড়ালের চোখের মতোই জ্বলত। 'চোখ বন্ধ কর' বললে ও চোখ বন্ধ করে ফেলত ঠিকই, কিন্তু তারপরেও সেই চোখের কথা মনে পড়লেই অনেকের প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যেত।

আর তা ছাড়া ওর অন্তত দুজন মক্কেল —ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিক রাধেশ্যাম পোদ্দার আর লক্ষ্মী গ্রিল ফ্যাক্টরির ছোটো পার্টনার সুবল গুছাইত বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় মদের নেশায় গেঞ্জি তুলে দেখিয়ে ফেলেছিল পিঠের আঁচড়ের দাগ। যারা দেখেছিল তারা একবাক্যে বলেছিল, ধুস শালা! এটা রেণুর কাজ হতেই পারে না। কোনো মেয়েমানুষ এইভাবে কাঁধ থেকে কোমর অবধি আঁচড়ে ফালা-ফালা করে দেয় না —সে যতই মেমসাহেব হোক। তোকে বেড়ালে আঁচড়েছে।

রেণুদের কোঠাবাড়ির মাসি মিনতিময়ীর বয়স হয়েছিল। সে ওই বাড়ির দোতলায়, রেণুবালার ঘরের ঠিক পাশের-ঘরে সারাদিন শুয়ে-বসে থাকত। মহিলার মেজাজ ছিল খুব চড়া। বিশেষ কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না। এমনকি থানার কনস্টেবলও হপ্তা নেওয়ার জন্যে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকত, দোতলায় ওঠার সাহস পেত না।

তো সেই মিনতিমাসিও দু-একজন কাছের লোককে বলেছিল, রেণুবালা আসলে নেপালের তরাই অঞ্চলের মেয়ে। ঘোর জঙ্গলের দেশ ছিল সেটা। তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে যখন দালালের হাত থেকে মিনতিময়ীর হাতে এসে পড়ে, তখনও ওই মেয়েটাও ছিল একটা আস্ত জংলি। নেহাত মিনতিময়ী প্রথম-দর্শনেই বুঝতে পেরেছিল, এ মেয়ের ভবিষ্যৎ আছে, তাই অনেক কষ্টে ওকে পোষ মানিয়েছিল। তবু প্রথমদিকে অনেক গ্রাহক ওর ঘর থেকে রক্তারক্তি হয়ে বেরিয়েছে।

গণিকাপল্লিতে রেণুবালার কোনো বন্ধু ছিল না, সখী ছিল না। ও সারাদিন নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমোত আর সূর্য ডুবলেই ছোট্ট একটা হাই তুলে প্রসাধন সারতে বসত। তারপর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াত। রেণুবালা রাতে ঘুমোত না। ঘরে খদ্দের না বসলেও ও সারারাত জেগে থাকত। এ কথাটা জানা গিয়েছিল রাস্তার ঠিক উলটোদিকের কোঠাবাড়িটার বাসিন্দাদের কাছ থেকে। ওরা সারারাত জানলার সামনে দিয়ে রেণুবালার চলাচল দেখতে পেত।

এসবের ফলে রেণুকে নিয়ে কিছুটা রহস্য বেনারসি-বস্তিতে ছিলই। মিনতিময়ী কিংবা ভেড়ুয়া নীলকান্ত এসব গুজবে প্রশ্রয়ই দিত, কারণ, ওদের ধারণা ছিল, যে-মেয়ের মধ্যে রহস্য যত বেশি, পুরুষের কাছে তার দামও তত বেশি। কিন্তু সেই রহস্য যে কিছুদিনের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে ওদেরই বুদ্ধি লোপ করে দেবে, সেটা ওরা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

হল কী — রেণুবালা হঠাৎ করেই একদিন ভারি অদ্ভুত আচরণ শুরু করল। তখন ওর বয়স কত হবে? বড়োজোর পঁয়ত্রিশ কী ছত্রিশ। প্রথমে সবাই ভেবেছিল মৃগীরোগ... মানে হিস্টিরিয়া। লক্ষণগুলো অনেকটা সেরকমই ছিল। মিনতিমাসি তার সবচেয়ে দামি মেয়েটার এরকম বেহাল অবস্থা দেখে তড়িঘড়ি ডাক্তারকে কল পাঠাল; মানে ডক্টর বিশ্বনাথ বসুকে।

ডক্টর বিশ্বনাথ বসুর পদবির পেছনে সবমিলিয়ে বারোখানা ইংরিজি অক্ষর ছিল। প্রথম চারটে হল এম, বি, বি এবং এস। বাকিগুলো তিনি লন্ডনের কুইনস-কলেজ থেকে লাভ করেছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যাটা তিনি ভালোবেসে শিখেছিলেন, শুধু পয়সা রোজগারের কারণে শেখেননি।

চিকিৎসাশাস্ত্রের যত গভীরে ঢুকছিলেন, ততই তিনি বুঝতে পারছিলেন ওই মহাশূন্য যতটা রহস্যময়, অণু-পরমাণুর আচরণ যতটা অজ্ঞেয়, ততটাই রহস্যময় নারীর শরীর। সেই শরীরের অনেক কিছুই এখনও বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

যেমন, অজস্র সংগমের মধ্যে ঠিক কোন সংগমটিতে নারীর গর্ভাধান হবে, বিজ্ঞান এখনও তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। জন্মের ঠিক আগের মুহূর্তে কোন জৈব-রসায়নের প্রভাবে গর্ভের শিশুর মাথা মায়ের বুকের কাছ থেকে জন্মদ্বারের দিকে নেমে আসে তা এখনও বিজ্ঞানের অজানা। অন্য সমস্ত স্তন্যপায়ী স্ত্রী-পশুর স্তন আকারে ছোটো, কিন্তু বৃন্ত অনেক বড়ো —যেমন শিম্পাঞ্জির স্তন কিংবা কুকুরের স্তন। শিশুদের স্তনদুগ্ধ পান করানোর পক্ষে স্তনের ওইরকম আকারই সুবিধাজনক। তাহলে মানবী কেন ব্যতিক্রম? কেন তার স্তন এতই বড়ো যে, একটু অসাবধান হলে মানবশিশু মায়ের স্তনের ভারে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে!

যতই পড়ছিলেন, ততই তিনি বুঝতে পারছিলেন, অতীতে এই পৃথিবীর নারীদের শরীরে খুব দূরাগত এবং অপার্থিব কোনো কিছুর ছোঁয়া লেগেছিল। সেই মহাজাগতিক অন্ধকারের স্পর্শেই তাদের শরীরে নানান রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেছে। হয়তো এখনও যায়। তিনি সেরকমই কিছুর খোঁজে ছিলেন।

এইসব কারণেই, মাত্র বত্রিশবছর বয়সে লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরে এসে ডক্টর বসু কোনো নামজাদা নার্সিং-হোমে চাকরি নিলেন না, যদিও তাঁর কাছে সেরকম ডাক অনেক এসেছিল। তার বদলে বেনারসি-বস্তির সীমানায় একটা পুরোনো একতলা বাড়ি কিনে প্র্যাকটিস শুরু করলেন।

দরিদ্র গণিকাদের কাছ থেকে তিনি ভিজিট নিতেন কুড়িটাকা মাত্র। কখনও তাও নিতেন না। বিয়ে করেননি। বাড়ির ছাদে একটা দামি টেলিস্কোপ বসিয়েছিলেন। গভীর রাতে সেটা দিয়ে তারা দেখতেন আর সারাদিন মেয়েদের শরীর। শুনতেন তাদের মনের সুখ-দুঃখের কথা। মেলাতে চাইতেন শরীরের সঙ্গে মনকে, মনের সঙ্গে মহাবিশ্বকে।

অর্থাৎ, রেণুবালা যেমন ছিল একজন ব্যতিক্রমী বেশ্যা, ডক্টর বসুও তেমনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী চিকিৎসক।

বিভিন্ন কারণে রেণুবালা নামে ওই মেয়েটা প্রথম থেকেই ডক্টর বসুর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। পাথরের মতন নিশ্চুপ মেয়েটার মনের তল তো কেউই পেত না —ডক্টর বসুও নন। কিন্তু ওর শরীরেও যে নানারকমের রহস্য ছিল, সেটা তিনি বুঝতে পারতেন। যেমন, এর আগে ছোটোখাটো শরীর-খারাপে রেণুবালার চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনি জেনেছিলেন, রেণুবালা কোনোকালেই গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে না। সেফ পিরিয়ড কাকে বলে তাও জানে না। জিজ্ঞেস করলে ও গম্ভীরমুখে জবাব দিত, আমার কিছু হবে না।

হতও না সত্যিই।

মিনতিময়ীকে ডক্টর বসু জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ-ব্যাপারে তার কী মনে হয়? মিনতিময়ী ক্যাজুয়ালি বলেছিল, কী আবার মনে হবে? রেণু একটা বাঁজা মেয়েছেলে। ডাক্তার হয়ে এটুকুও বোঝেন না?

ডক্টর বসু মিনতিমাসির সঙ্গে কোনো রকমের তর্কে জড়াননি। সেটা তার স্বভাবই নয়। তবে মনে-মনে তিনি মাথা নাড়তেন। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, রেণুর শরীরে কোনো খুঁত নেই। কোটি-কোটি সফল সন্তানবতী মায়েদের মতই প্রতিমাসে একটা করে সুস্থ সবল ডিম্বাণু ওর ফ্যালোপিয়ান টিউব বেয়ে জরায়ুতে পৌঁছোয়। কোনো রকমের বাধা থাকে না। তবু প্রতিরাতে ওর যোনির মধ্যে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শুক্রাণু সেই ডিম্বাণুটাকে নিষিক্ত করতে পারে না। কেন পারে না? ও কি মানুষ নয়?

সেইজন্যেই মিনতিময়ীর কল পেয়ে ডক্টর বসু কালবিলম্ব না করে মাসির কোঠাবাড়িতে হাজির হলেন। দেখলেন রেণুবালার ব্লাড প্রেশার আর টেম্পারেচার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি। চোখের তারা এতটুকুও ছড়িয়ে পড়েনি। সমস্তরকমের রিফ্লেক্স ঠিক কাজ করছে। তার মানে ওর শরীরে কোনো অসুখ নেই। তবু ও ভীষণ অস্থির।

পরীক্ষার অছিলায় একবার ডক্টর বসু রেণুবালার তলপেটের দিকে দেখলেন, তারপর দেখলেন ওর বুক। দুটো জায়গাই সিঁদুরের মতন লাল হয়ে ছিল। এই লক্ষণটা উনি চেনেন। রেণুবালার অন্য কিছুই হয়নি। ও শুধু কামার্ত। তীব্রভাবে কামার্ত।

একজন গণিকা কখন কামাতুর হয়? এই কথা ভাবতে-ভাবতে ডক্টর বসু অন্যমনস্কভাবেই প্রেসক্রিপশন লিখলেন। একটা ঘুমের ওষুধ আর ভিটামিন। উনি জানতেন, এসব ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই। ওর যা প্রয়োজন, তার জন্যে বাড়ির দরজায় বেশ কয়েকজন ব্যাটাছেলে সন্ধেবেলা থেকে ঘুরঘুর করছে, অথচ রেণুবালা তাদের কাউকে চোখ তুলেই দেখছে না। তাহলে কী চায় ও? কাকে চায়? কে ওর নির্বাচিত পুরুষ?

যাবার আগে ডক্টর বসু মিনতিময়ীকে বলে গেলেন —ওকে ঘুমোতে দিন। মনে হয় ওভারস্ট্রেন হয়ে গিয়েছে। ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিনতিময়ী সেই রাতটা নিজেও ঘুমোলেন না, তবে রেণুবালাকেও ঘুমোতে দেখলেন না। সারারাত খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল রেণুবালা। পরদিন সকালে মিনতিময়ী দেখলেন পাগলামি বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

বস্তির অন্য মেয়েরা রগড় দেখবার জন্যে ওর ঘরের সামনে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু রেণুর রকম-সকম দেখে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। সত্যিই সে দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যায় না। ওই গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে তখন আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে কাকে যেন সাধছিল ওর কাছে আসবার জন্যে, ওকে ভালোবাসবার জন্যে। আর সেই সাধ্যসাধনার পুরোটার সঙ্গেই এমন শরীরী ইঙ্গিত জড়িয়ে ছিল যে, বেশ্যা-মেয়েগুলো অবধি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলছিল, ছিঃ! তারপর তারা চলে গেল। রেণুবালাকে আগলে বসে রইল কেবল মিনতিময়ী।

মিনতিময়ীর আর্জেন্ট-কল পেয়ে সেদিন সন্ধেবেলায় আবার ডক্টর বসু এলেন। দোতলায় রেণুবালার ঘরে ঢুকেই তিনি মাসিকে বললেন, কীসের গন্ধ বলুন তো! অ্যানিম্যাল স্টিঙ্ক। ভয়ানক জান্তব গন্ধ। ভাম-টাম ঢুকেছিল নাকি ঘরে?

মিনতিময়ী নাক টেনে বললেন, কই না তো! আমি তো কোনো গন্ধ টের পাচ্ছি না। তা ছাড়া সারাদিন এখানেই বসে আছি, ভাম, খাটাশ কিছুই ঢুকতে দেখিনি।

দরজার কাছে নীলকান্ত দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গন্ধ পাচ্ছ না, নীলকান্ত?

নীলকান্ত বলল, পাচ্ছি ডাক্তারবাবু। ওই গন্ধটার জন্যেই শরীরটা কেমন আনচান করছে যেন। আমি নিচে গিয়ে দাঁড়াই। দরকার হলে ডাকবেন।

ডাক্তারবাবু চিন্তিতমুখে বিছানার দিকে তাকালেন। চৌকির মাথার কাছের দেয়ালটায় হেলান দিয়ে, দু-হাতের মধ্যে হাঁটুদুটোকে জড়িয়ে ধরে উদাসমুখে বসে ছিল রেণু। তার দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে হারিয়ে গিয়েছিল। তখন তার শারীরিক অস্থিরতা অনেক কমে গিয়েছিল। যেন কোথাও থেকে শ্রবণের অতীত এক আশ্বাস পৌঁছেছিল তার কাছে। মধুর হয়ে উঠেছিল রেণুর চোখমুখের ভাব। কিন্তু তখনও সে ক্রমাগত ফিসফিস করে ডেকে চলেছিল —এসো, এসো, এসো।

ফরফর করে একটা আওয়াজ শুনে ডক্টর বসু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, জানলা দিয়ে বড়োসড়ো একটা মথ ঘরে ঢুকে দেয়ালের কাছে ডানা ঝাপটাচ্ছে। তারই শব্দ। উনি তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই আর একটা

মথ ঘরে ঢুকে পড়ল, তারপর আর একটা। দেখতে-দেখতে প্রায় দশ-বারোটা মথ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর যেটা হল, সেটা আরো বিস্ময়কর। দেয়ালের গা-বেয়ে পিছলোতে-পিছলোতে কীসের টানে যেন মথগুলো ঠিক রেণুবালার উরুর ওপরেই খসে পড়তে লাগল।

তখনও আরও মথ ঢুকছিল জানলা দিয়ে। মিনতিময়ী বলল, আ মরণ! ওর গায়ে কী মধু আছে তোদের?

ডক্টর বিশ্বনাথ বসু বিছানার পায়ের দিকে ভাঁজ করে রাখা একটা কম্বল তুলে নিয়ে ভালো করে রেণুবালাকে আপাদমস্তক জড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখলেন, মথগুলো একটা একটা করে খোলা জানলা দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে ওনার মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। স্টেথোটা ব্যাগে পুরে রাখতে-রাখতে বললেন, মধু নয়। ফেরোমন।

*****

যেমন হঠাৎ করে পাগল হয়ে গিয়েছিল রেণুবালা, তেমনি হঠাৎ করেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মাঝখানে চার-পাঁচটা দিন যে কী হয়েছিল কেউ কিছু বুঝতে পারল না, শুধু মিনতিময়ী একটা খামে ভরে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট ডক্টর বসুর টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, মেয়েটাকে আপনি বাঁচালেন ডাক্তারবাবু। আপনার কাছে কেনা হয়ে রইলাম।

ডক্টর বসু অবাক হয়ে বললেন, সেরে গেছে!

নিজের দেওয়া ঘুমের ওষুধ আর ভিটামিনে তাঁর নিজের কোনো আস্থা ছিল না। রেণু সেরে গিয়ে থাকলে তার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে। রেণু কি কোনোভাবে ইতিমধ্যে কাম চরিতার্থ করতে পেরেছে?

দুদিন যেতে না যেতেই মিনতিময়ী বুঝল একশো-টাকা একেবারে বাজে খরচ হয়ে গেছে। কারণ, রেণুবালা সেরে উঠলেও খদ্দের বসাচ্ছে না।

বসাচ্ছে না মানে বসাচ্ছে না। মিনতিমাসি আর নীলকান্ত প্রথমে ভালোকথায় বলে, তারপরে খিস্তি দিয়ে কিছুতেই ওকে রাজি করাতে পারল না। অথচ শরীর যে ঠিক আছে সেটা খাওয়া-দাওয়া আর ঘুম

দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল। দুটোই আগের চেয়ে বেড়েছিল। নীলকান্তকে দিয়ে আপেল, বেদানা-টেদানা আনিয়ে খাচ্ছে। আগে কোনোদিন দুধ খেত না। এখন কদিন হল নিজে থেকেই চেয়ে দুধ খাচ্ছে। আর রাতে সেই-যে দশটা নাগাদ মশারির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, উঠছে একেবারে বেলা আটটায়।

মিনতিমাসি ওকে জিজ্ঞেস করে, তোর কি এখানে বাপের জমিদারি আছে যে দুবেলা বসে-বসে খাচ্ছিস? ব্যাবসা করতে হবে না?

রেণুবালা উত্তর না দিয়ে লাজুক হাসে।

সেই হাসি দেখে মিনতিময়ীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এরকম ঠ্যাঁটামি সে সারা জীবনে অনেক দেখেছে। এসব ঠ্যাঁটামি কেমন করে ভাঙতে হয় তাও সে ভালো করেই জানে। একসপ্তাহের মাথায় একদিন মাসি নীলকান্তকে বলল, মনুয়া আর বাবুলালকে খবর দিয়ে আয়, আজ রাতে রেণুর ঘরে ঢুকতে হবে।

মনুয়া আর বাবুলাল বেনারসি বস্তির দাদা। এইধরনের কাজে সিদ্ধহস্ত। নতুন মেয়েগুলো কোঠাবাড়িতে আসার পরে তাদের প্রথম রেপটাও করে ওই দুজন। তার বদলে ওরা মিনতিমাসির কোঠাকে পুলিশ কিংবা পলিটিকাল লাফড়া থেকে প্রোটেকশন দেয়। একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া আর কী।

সেদিন রাত দুটো নাগাদ বাইরে থেকে খুন্তির চাড় দিয়ে খিল খুলে ওরা দুজন রেণুর ঘরে ঢুকেছিল। মাসি পাশের ঘরে নিজের বিছানায় বসে অপেক্ষা করছিল, কখন ওদের কাজ শেষ হয়। জ্বালা কম? এর পর যদি রেণুর সেবা-শুশ্রূষার দরকার পড়ে, সেটাও তো মাসিকেই করতে হবে। সেইজন্যেই জেগে থাকা।

রেণুবালার ঘর থেকে কিছু কাতরানি, কিছু শাপমণ্যি ভেসে আসবে সেটা মাসি জানত। কিন্তু তার বদলে একটু পরেই মাসি শুনতে পেল বারান্দায় বেশ জোরে গরগরানির আওয়াজ। যেন অনেকগুলো কুকুর...।

কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব?

মাসি সাবধানে নিজের ঘরের দরজাটা ফাঁক করে দেখল, সত্যিই কুকুর। অন্তত দশ বারোটা কালো কুকুর সিঁড়ি দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে

লোকদুটোকে টেনে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। নামবার সময় টুঁটি টিপে ধরেছিল নিশ্চয়ই। মনুয়া আর বাবুলাল চ্যাঁচাতে পারছিল না।

পরের দিন ভোরের ফার্স্ট-ট্রেনের প্যাসেঞ্জারেরা বেনারসি-বস্তির পেছনের ড্রেনটার পাশে মনুয়া আর বাবুলালের আধখাওয়া শরীরদুটো দেখতে পেয়েছিল। চতুর্দিকে অজস্র খাবার দাগ দেখে কারুর সন্দেহ ছিল না, ওদের কুকুরেই খেয়েছে। তবে কারা খুন করে ওদের ওখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল, সেটা পুলিশ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

মিনতিময়ী একবার ভেবেছিল পুলিশকে বলবে, খুনটাও ওই কুকুরগুলোই করেছে। কিন্তু সেটা পাগলের মতন শোনাবে বলে আর কাউকে কিছু বলেনি। বরং বালতি-বালতি জল ঢেলে নিজের হাতে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা ধুয়ে দিয়েছিল।

মাস-তিনেক বাদে মিনতিমাসি আবার ডক্টর বসুর চেম্বারে গেল। বসে রইল, যতক্ষণ না অন্য রুগিরা বিদায় নিচ্ছে। তারপর ডাক্তারবাবুর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, শুনুন ডাক্তারবাবু! রেণুবালার পেটে বাচ্চা এসেছে।

ডক্টর বসু চোখ গোলগোল করে বললেন, কেমন করে বুঝলে?

মিনতিময়ী ফিসফিস করেই বলল, যেমন করে সবাই বোঝে। তিন-মাস হল মাসিক হচ্ছে না, তলপেট ঠেলে উঠছে, ওয়াক তুলছে। ওই জন্যেই খদ্দের বসাচ্ছিল না, বুঝলেন? সে যাই হোক, আপনি আমাকে বলুন তো ডাক্তারবাবু, ব্যাটাছেলের সঙ্গে না শুলে কি পেটে বাচ্চা আসে?

ডক্টর বসু জোরে জোরে দুদিকে ঘাড় নাড়লেন।

কিন্তু এসেছে তো। মেয়েটা তো সারাদিন আমার পাশের ঘরেই রয়েছে। পুরুষমানুষ তো কোন ছাড়, একটা হুলোবেড়াল অবধি এর মধ্যে ওর ঘরে ঢোকেনি, সে আমি মা শেতলার দিব্যি গেলে বলতে পারি।

ডক্টর বসু বললেন, তাহলে?

তাহলে কী জানি না। তবে ওই বাচ্চাটা আপনাকে নষ্ট করতে হবে। এই বলে মিনতিময়ী ডাক্তারবাবুর হাতে আবার একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা অ্যাডভান্স। কাজ হয়ে গেলে যা বলবেন দিয়ে দেব।

ডক্টর বসু খামটা মাসির হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

আমাকে আগে একবার দেখতে দাও। তুমি যা বলছ, তাতে তো মনে হচ্ছে 'ফল্‌স প্রেগন্যান্সি'।

মানে?

মানে, অনেকসময় পেটে টিউমার হলেও বাইরে থেকে মনে হয় বুঝি বাচ্চা এসেছে। কাজেই টাকাটা এখন রাখো। আমি আগে একবার রেণুকে দেখে আসি। তারপর তোমাকে বলব, কী করতে হবে।

কবে যাবেন? আজকেই চলুন না, এখনই। দেখছেন তো কেমন বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের পাড়া আজ ফাঁকা। চোদ্দোটা লোকের কাছে আমায় জবাবদিহি করতে হবে না। আপনি আসুন, আমি একটু আগে চলে যাচ্ছি। সদর-দরজা ভেজানো থাকবে। ঠেললেই খুলে যাবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, বেশ যাচ্ছি। তুমি এগোও।

মিনতিমাসি বেরিয়ে যাবার পরে ডক্টর বোস কী মনে করে ঘরের জানলার পাশে ছোট টেলিস্কোপটাকে বসিয়ে, সেটাকে মাসির কোঠাবাড়ির দোতলার জানলার দিকে তাক করলেন। একচান্সেই তো আর ঠিক জায়গায় অ্যাডজাস্ট হয় না। প্রথমে রেণুর ঘরের জানলার নীচের রাস্তাটায় ফোকাস হল। ডক্টর বসু দেখলেন সেখানে সাত-আটটা মিশমিশে কালো কুকুর ওপরের দিকে মুখ তুলে বশংবদের মতন বসে-বসে ল্যাজ নাড়ছে। টেলিস্কোপের ভিউ-ফাইন্ডারের মধ্যে দিয়ে তিনি কুকুরগুলোর ভোঁতা মুখ, জ্বলন্ত চোখ আর ধারালো শ্বদন্তের সারি পরিষ্কার দেখতে পেলেন। এরকম কোনো রাস্তার কুকুর তিনি এর আগে কলকাতায় দেখেননি। কুকুরগুলোর সবুজ চোখের মণি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল।

রাস্তা থেকে দেয়াল বেয়ে টেলিস্কোপের নলের ডিরেকশন রেণুর ঘরের জানলায় তুলে আনামাত্রই তিনি ভীষণ চমকে উঠলেন। দেখলেন, ঠিক কুকুরের চোখের মতোই চারটে সবুজ চোখের মণি এক লহমার জন্যে খোলা-জানলার ফাঁকে চকচক করে উঠেই ঘরের ভেতরে চলে গেল।

ওর মধ্যে দুটো মণি না হয় রেণুর। কিন্তু বাকি দুটো?

ডক্টর বসু আর দেরি করলেন না। চটপট রেন-কোটটা গায়ে চাপিয়ে, বাড়ির দরজায় তালা দিয়ে মিনতিময়ীর কোঠাবাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন।

ঠেলা মারতেই কোঠাবাড়ির সদর দরজা খুলে গেল ঠিকই, কিন্তু তারপরেও ডক্টর বসু কাউকে দেখতে না পেয়ে উঠোনের একধার দিয়ে উঠে যাওয়া খোলা সিঁড়িটার ধাপে পা রাখলেন। তখনও মিনতিময়ী দেখা দিল না। অগত্যা ডাক্তারবাবু পা টিপে-টিপে দোতলায় উঠে গেলেন এবং দেখলেন মিনতিময়ীর ঘরে যদিও আলো জ্বলছে, তবু সে-ঘরে লোক নেই। তিনি পাশের ঘরে উঁকি মারলেন।

পাশের ঘরটা ছিল অন্ধকার। বারান্দার আলোর অল্প একটু অংশ দরজার ফাঁক গলে ভেতরে বিছানার ওপরে পড়েছিল। সেই আলোতেই ডাক্তারবাবু দেখলেন রেণুবালা বিছানার ওপরে বসে আছে। শিরদাঁড়া টান-টান। সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রেণু। চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরছে। খুব সন্তর্পণে ওর দিকে এগোলেন ডক্টর বসু। বললেন, চিন্তা কোরো না রেণু। আমি তোমার ভালো চাই। তুমি তো আমাকে চেনো।

কথা বলতে-বলতেই চোখের কোনা দিয়ে ঘরটার চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন তিনি। বাকি একজোড়া চোখের মালিক – সে কোথায়?

না, ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। পালিয়েছে নিশ্চয়ই। রেণুর দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। — ভাবলেন ডক্টর বসু। ওর দিকে আরও কয়েক-পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, পেটের বাচ্চাটাকে একবার দেখতে দেবে? এই সময়ে একবার দেখিয়ে নেওয়া ভালো। তুমি তো জানো।

রেণু মুখে কিছু না বলে আস্তে-আস্তে বিছানার ওপরে শুয়ে পড়ল। ডক্টর বসু মনে-মনে ভাবলেন, মা তো! বাচ্চার ভালোর কথা বললে আর কোনো প্রতিরোধ থাকে না। তিনি নিশ্চিন্তে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর খাটের পাশে বসলেন। রেণুর শরীরে একটা ছাপা শাড়ি আলতো করে জড়ানো ছিল। ভেতরে ব্রা-ব্লাউজ-শায়া আর কিছুই ছিল না। ডক্টর বসু আলতো করে স্টেথোটা ওর তলপেটে বসাতেই নির্ভুলভাবে ভ্রূণের অস্তিত্ব টের পেলেন।

ফল্‌স প্রেগন্যান্সি নয়। রেণু সত্যিকারেই গর্ভবতী।

এর পর ডক্টর বসু ক্যাজুয়ালি স্টেথোটা ওর বুকে বসিয়েই শক খাওয়ার মতন চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে নিজেকে একটু

শান্ত করার পর খুব ঠান্ডা গলাতেই বললেন —আঁচলটা সরাও। আমাকে দেখতে দাও।

রেণু বিনা বাক্যব্যয়ে আঁচল সরিয়ে বুকটা উদোম করে দিল। ঘরের অল্প আলোয় ডক্টর বসু দেখলেন ওর দুটো স্তনের ঠিক মাঝখানে তৃতীয় একটা স্তন গজিয়ে উঠেছে।

রেণু এখন ত্রিস্তনী নারী।

ডক্টর বসুর মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিলেন, শয়তানের বাচ্চাকে পেটে ধরলে নারীর তৃতীয় স্তন গজিয়ে ওঠে। মানুষের শিশুদের জন্যে ঈশ্বর নারীর বুকে যে দুটি স্তন দিয়েছেন, তার থেকে দুধ খেতে পারে না শয়তানের বাচ্চা। তাই তৃতীয় স্তনের উদ্‌গম হয়।

ডক্টর বসু নিজের হাতে আঁচল দিয়ে রেণুর বুকটা ঢাকা দিয়ে বললেন, মাসি কোথায়?

রেণু ইশারায় ওর খাটের নীচটা দেখালো। ঘাড় নীচু করে ডাক্তারবাবু দেখলেন ভুল বলেনি। ওখানেই মাসি উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। তবে উপুড় হয়ে পড়ে থাকলেও মাসির মুখটা দেখা যাচ্ছে। মিনতিময়ীর মুণ্ডুটাকে কেউ মোচড় দিয়ে পেছনদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ডক্টর বসুর হাত-পাগুলো অল্প অল্প কাঁপছিল। তবু তিনি বুঝতে পারছিলেন, যার খোঁজে তিনবছর আগে বেশ্যাপাড়ায় ঘর বেঁধেছিলেন, তার খোঁজ তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি ডাক্তারি-ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা ভাঁজ করা বড়ো প্লাস্টিকের প্যাকেট বার করে রেণুর হাতে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে সামান্য পোশাক-আশাক যা দরকার ভরে নাও। বুঝতেই পারছ, এখানে থাকলে তুমিও বাঁচবে না, তোমার পেটের বাচ্চাটাও বাঁচবে না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে পালাবে চলো।

আমি বাড়ি থেকে গাড়িটা নিয়ে বড়ো রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তুমি ওখানেই চলে এসো। আর হ্যাঁ...

রেণু চোখ তুলে তাকাল।

তিনি এখনও এই ঘরে আছেন কি না জানি না। তাঁকে বোলো আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আমি শুধু নিজের হাতে তোমার সন্তানের জন্ম দিতে চাই। তাকে দেখতে চাই। আর কিছু না।

*****

পাহাড়ি ঝোরার ধারে একটা ছোটো পাথরের ওপরে চুপ করে বসে ছিল ইভিল। ও যেখানে বসে ছিল, ঠিক তার সামনেই কয়েকটা পাথরের মাঝখানে একটু জল জমে ছিল। তীব্র স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শান্ত সবুজ একটু জল। নেল-কাটারের ছুরির মতন ছোটো আর রুপোলি একঝাঁক মাছ ওই জলটুকুর মধ্যে খেলা করছিল। ইভিলেরও তাই দেখে খেলা করতে ইচ্ছে হল, তাই ওদের মধ্যে একটা মাছকে বলল, তুই অন্য মাছগুলোকে খেয়ে ফেল।

সেই মাছটা এক-এক করে অন্য মাছগুলোকে খেতে শুরু করল। যতই খাচ্ছিল ততই সেই মাছটা আকারে বড়ো হচ্ছিল, চেহারা বদলে যাচ্ছিল তার। শেষ অবধি শান্ত জলের কুণ্ডটার মধ্যে সেই অদ্ভুত জন্তুটা একাই রয়ে গেল। কালো পুরু ঠোঁটের মতন দেখতে একটা জন্তু। ঠোঁটের মতোই তার শরীরের দুটো ভাগ মাঝেমাঝে ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল। তখন দেখা যাচ্ছিল ভেতরে ধারালো দু-সারি দাঁতও রয়েছে।

ঠোঁটের মতন জন্তুটাকে একটু বাদে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিল ইভিল। সবুজ কুণ্ডটার মধ্যে থেকে একঝলক দুর্গন্ধ উঠে এল। তবে বেশিক্ষণ রইল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের দিক থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে সেই বিষবাষ্পকে শুষে নিয়ে চলে গেল। ইভিল অন্য একটা গন্ধ পেল। ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পেছনে —যেখানে নদীর পাড় ঢালু হয়ে ওপরে উঠে গেছে। মিশেছে গিয়ে ফরেস্ট-বাংলোর সামনের রাস্তায়।

এই নদী, বন আর ওই ফরেস্ট বাংলো ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে, এই লখিয়াঝোরায়। মানুষ বড়ো কম। পশুপাখিই বেশি। তাই ইভিলকে একা-একাই খেলা করতে শিখতে হয়েছে।

হ্যাঁ, সেই অন্য একটা গন্ধ। ইভিল মেয়েটার স্নানের গন্ধ পেল। কিছুটা দারচিনি সাবান, কিছুটা কমলাফুলি শ্যাম্পু, গরম জল, রোদে শুকোনো টাওয়েল। কিন্তু ওসব কিছু নয়। ওইসব গন্ধ ছাপিয়ে তীব্র একটা মদির গন্ধ ইভিলকে টানছিল। টানছিল বাংলোর স্নানঘরের দিকে —যেখানে তাহিতি এই মুহূর্তে স্নান করছে। ওই অচেনা গন্ধটা তাহিতির গা থেকেই আসছে।

স্নানঘরের জানলাটা দেয়ালের অনেক উঁচুতে বসানো। কিন্তু ইভিলের ইচ্ছে করছিল তাহিতির স্নান দেখে।

একটা গিরগিটি একটু দূরে একটা পাথরের ওপর শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। ইভিল সেটাকে মনের একটা জোরালো ঝটকায় একদম নিজের পায়ের কাছে এনে ফেলল। তারপর গিরগিটির মুণ্ডুটাকে একটা চোখের মণি বানিয়ে দিয়ে বলল, যা। গিরগিটিটা দৌড়োতে-দৌড়োতে স্নানঘরের দেয়াল বেয়ে খোলা জানলার পাল্লায় গিয়ে বসল। ওর চোখ দিয়ে ইভিল প্রাণ ভরে তাহিতির নগ্নতা দেখল।

স্নান করে বেরিয়ে তাহিতি বাংলোর বারান্দায় শীতের রোদে চেয়ার পেতে বসল। ও একেবারে জঙ্গলে ঘুরবার জন্যে তৈরি হয়েই বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। তাই ওর গায়ে এখন খাকি কালারের কার্গো প্যান্ট আর সবুজ একটা কর্ডুরয়ের শার্ট। পায়ে মোটা সোলের স্নিকার। পাশের টি-টেবিলের ওপরে নামানো আছে ওর ক্যাম্বিসের রুকস্যাক, যার ভেতরে যথারীতি ক্যামেরা, বাইনোকুলার, নোটবুক আর জলের বোতল গোছানোই রয়েছে।

অরুণের সঙ্গে ডিভোর্সের পরে-পরেই তাহিতি মিত্র সল্টলেকে চাকুরিরতা মহিলাদের যে আবাসনটা আছে সেখানে উঠে এসেছিল। তার মানে বছর দুয়েক হল। এই দু-বছরে পাশের ফ্ল্যাটের তৃপ্তি ঘোষালের সঙ্গে ওর একরকমের আত্মীয়তাই গড়ে উঠেছে যেন।

তৃপ্তিদি ওর থেকে মাত্র চারবছরের বড়ো। মানে ওর বত্রিশ হলে তৃপ্তিদির ছত্রিশ। অদ্ভুত মানুষ তৃপ্তিদি। পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট ছিল। বড়ো সরকারি চাকরি করে। ও নিজের সিদ্ধান্তেই বিয়ে করেনি, একলা জীবন কাটাচ্ছে। ওর মতে সংসারটা একটা ন্যুইসেন্স ছাড়া কিছু নয়। ওতে পায়ে বেড়ি পড়ে যায় —বিশেষত মেয়েদের। পৃথিবীটাকে দেখা হয় না; শিল্প-সাহিত্য উপভোগ করা হয় না।

তৃপ্তিদি খুব দেশ বেড়ায় আর গান শোনে। দেশে এবং বিদেশে আর্ট গ্যালারিগুলোতে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখে। অকশন থেকে সুন্দর-সুন্দর জিনিস কেনে।

ডিভোর্সের পরে তাহিতি একটা গভীর মানসিক অবসাদের কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তৃপ্তিদিই খুব যত্নে আর স্নেহে ওকে আবার আলো-রোদ্দুরের জগতে তুলে এনেছিল। এই আবাসনে আসার কিছুদিন পর

থেকেই তৃপ্তিদি ওকে নিজের ভ্রমণসঙ্গিনী করে নিয়েছে। তাহিতি এখন দিব্যি রয়েছে। এখানে, মানে এই লখিয়াঝোরাতেও ও তৃপ্তিদির সঙ্গেই এসেছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের ডাকাডাকি কমে গেছে ঠিকই, কিন্তু ওড়াউড়ি বহাল রয়েছে। বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যেই এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বেড়াচ্ছিল স্কারলেট-মিনিভেটের ঝাঁক। দুটো ভার্ডিটার-ফ্লাইক্যাচার সেগুন গাছের চূড়া থেকে মাঝেমাঝেই ডাইভ মেরে পোকা ধরে আনছিল। তা ছাড়াও ফিঙে, দোয়েল, ঘুঘু আরও কত পাখি। পেছনের বাগানে শিশু গাছে ফুল ফুটেছে বোধহয়। তার মিষ্টি গন্ধ এত দূরেও ভেসে আসছে।

কাল রাত্রে ওই গন্ধ কোথায় ছিল? কোথায় ছিল পাখিরা? বনের পশুরাই বা কোথায় ছিল?

লখিয়াঝোরা এক আশ্চর্য অরণ্য, সত্যি। গত দু-বছরে তৃপ্তিদির সঙ্গে ভারতের বেশ কয়েকটা জঙ্গল ঘুরে ফেলেছে তাহিতি। লখিয়াঝোরা তাদের সবার থেকে আলাদা। অন্য সব জায়গায় ও দেখেছে, রাত বাড়লে অরণ্য জেগে ওঠে। অরণ্য জেগে ওঠে মানে আসলে তার নিশাচর বাসিন্দারা জেগে ওঠে। তাদের ডাক শোনা যায়। নাইটজার আর চোখ গেল পাখির ডাক। দূর থেকে ভেসে আসা হাতির পালের বৃংহণ কিংবা চিতাবাঘের করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতন ফ্যাশফেশে ডাক। বর্ষার রাত হলে ব্যাঙেদের অবিশ্রান্ত কলকলানি। আর এই সব কিছুর ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রমাগত বেজে চলে ঝিঁঝিপোকাদের কনসার্ট।

কাল রাতে তাহিতি এই লখিয়াঝোরার বাংলোর ঘরে বসে সেসব কিছুই শুনতে পায়নি। এই বনে কি পশুপাখি কিংবা পতঙ্গ নেই? তারা ডাকে না? নাকি এই বাংলোর চারিদিকে একটা অদৃশ্য দেয়াল রয়েছে, যেখানে সমস্ত শব্দ আটকে যায়?

অথচ এই শব্দ নিয়ে তৃপ্তিদির অভিজ্ঞতা অন্যরকমের। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কাল রাত একটু গভীর হওয়ার পর থেকেই তৃপ্তিদি নাকি মাঝে মাঝেই কোনো পুরুষের গভীর শ্বাসের শব্দ পাচ্ছিল। একই ঘরে থেকে, অনেক চেষ্টা করেও তাহিতি সেরকম কোনো শব্দ শুনতে পায়নি। সে খুব কাতর হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ও তৃপ্তিদি, শব্দটা কেমন,

বলো না! আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!

পাচ্ছিস না? কী লোভী ইতর একটা প্রশ্বাস! যেন আমার গায়ের গন্ধটাই বুক ভরে টেনে নিচ্ছে।

কোনদিকে তৃপ্তিদি? কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে দেখাও তো।

তৃপ্তিদি তাই শুনে বিহ্বলভাবে ঘরের চারিদিকে তাকাল। বলল, চারদিক থেকেই আসছে। যেন বাংলোটাকে চক্কর দিয়ে কেউ ঘুরছে।

একই ঘরে দুটো খাট ছিল। একটায় ও শুয়ে ছিল, আর একটায় তৃপ্তিদি। রাত হয়েছিল অনেক। কিছুক্ষণ শুয়ে-শুয়ে সেই আওয়াজটা শুনবার চেষ্টা করতে-করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল তাহিতি। কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ তৃপ্তিদির ডাকে ওর ঘুম পাতলা হয়ে গেল। তৃপ্তিদি ওকে জিজ্ঞেস করছিল, একটা গন্ধ পাচ্ছিস তাহিতি?

তাহিতি আধোঘুমের মধ্যে বলল, আমি কপালে একটু পেন-বাম লাগিয়েছিলাম গো। স্যরি। তোমার অসুবিধে হবে বুঝতে পারিনি।

ধুর ছাতা! প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল তৃপ্তিদি। পেন-বামের গন্ধ আমি চিনি না? এটা ব্যাটাছেলের ঘামের গন্ধ। বিচ্ছিরি। ঝাঁজালো।

শুনে ধড়মড় করে কম্বল-টম্বল গা থেকে সরিয়ে উঠে বসেছিল তাহিতি। এ তো সর্বনেশে কথা! কেউ ঢুকে পড়েছে নাকি ঘরে?

কিন্তু না। শব্দের মতন গন্ধটাও একা তৃপ্তিদিই পেয়েছিল। ও কোনো অন্যরকম গন্ধ পায়নি। তবে তৃপ্তিদির কাছে ব্যাপারটা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। এতটাই যে, একটা সময়ে আর থাকতে না পেরে তৃপ্তিদি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়েছিল।

তাহিতিও গায়ে একটা উলের চাদর জড়িয়ে নিয়ে তৃপ্তিদির সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়েছিল। বেরোবার আগে দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটায় চোখ পড়েছিল। রাত তিনটে বেজে পনেরো-মিনিট।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তৃপ্তিদি জোরসে ডেকে উঠেছিলেন, কাঞ্ছা! এই কাঞ্ছা! জলদি আও তো ইধার! ভদ্রতা রাখবার জন্যে তাহিতিও গলা মিলিয়েছিল।

ওদের ডাক শুনে বাংলোর আউটহাউস থেকে আঠেরো-উনিশ বছরের ছেলেটা হাতে টর্চ নিয়ে, লন পেরিয়ে চলে এসেছিল। ছেলেটা বেশি জোরে চলাফেরা করতে পারে না। বেচারির পায়ের পাতাদুটো

কোনো অসুখে ডিফর্মড হয়ে গেছে। সারাক্ষণ মোটা মোজা পরে থাকে আর একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করে। তবু ওই পা নিয়েই যতটা তাড়াতাড়ি পারে চলে এসেছিল কাঞ্ছা। জিজ্ঞেস করেছিল, কেয়া হুয়া মেমসাব?

ওই শব্দটা কীসের? এই বিচ্ছিরি গন্ধটাই বা কোথা থেকে আসছে? জিজ্ঞেস করেছিল তৃপ্তিদি।

কাঞ্ছা অবাক হয়ে উলটে প্রশ্ন করেছিল কীসের শব্দ মেমসাব? গন্ধই বা কোথায়? আমি তো কিছু পাচ্ছি না।

তৃপ্তিদি অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে আবার ঘরে ফিরে এসেছিল। তারপর উপুড় হয়ে বালিশ দিয়ে কান-মাথা ঢেকে শুয়ে পড়েছিল। নিজের বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে ছিল তাহিতি। কাঠ হয়ে, কারণ ও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল তৃপ্তিদির ফোঁপানির শব্দ। একটু বাদে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিল, কাঁদছ কেন তৃপ্তিদি?

উত্তরটা ছিল ভারি অদ্ভুত। তৃপ্তিদি দাঁতে দাঁত চিপে বলেছিলেন, আমার ঘেন্না হচ্ছে। নিজের ওপরে ঘেন্না হচ্ছে আমার।

কেন? ভারি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল তাহিতি।

আমার ইচ্ছে করছে... ভীষণ ইচ্ছে করছে। তুই কি বুঝতে পারছিস তাহিতি, আমি কী বলতে চাইছি?

বুঝতে না-পারার কোনো কারণ ছিল না, কারণ তাহিতি নিজেও একটা মেয়ে। বেডল্যাম্পের ম্লান আলোতেও ও দেখতে পাচ্ছিল, তৃপ্তিদির নাকের ডগায় আর গলার ভাঁজে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। পাতলা রাতপোশাকের আবরণ ঠেলে উঠেছে ওর দুই কঠিন স্তনবৃন্ত।

*****

কুয়াশা জড়িয়ে ছিল গাছের ডালে, লতাপাতায়। কুয়াশা জড়িয়ে ছিল পাখির বাসায় আর মসের জটায়। এতই ঘন আর ভারী সেই কুয়াশা, মনে হচ্ছিল তার নীচে যেন এই পুরো লখিয়াঝোরার বনভূমি মাটিতে নিচে বসে যাবে।

ইভিল সেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছিল। হঠাৎই তার চোখদুটো বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল। ওই অ্যাজেলিয়ার ঝোঁপটার মধ্যে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে কেন? কোন সাহসে? ওরা জানে না, আজ কোনো শব্দ করা বারণ? ইভিল অস্ফুটে বলল, মর! তোরা মর! সঙ্গে সঙ্গে ঝোঁপটার নীচে টপটপ করে কয়েকশো পোকার মৃতদেহ খসে পড়ল।

কুয়াশার চাদরে আজ এমনিতেই সমস্ত শব্দ, সমস্ত গন্ধ ঢাকা পড়ে গেছে। তবু কিছু বুনো কুন্দফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। ইভিল সেই গন্ধ বুকে টেনে নিয়ে আবার নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে দিতেই সবজেটে কুয়াশার একটা স্রোত গাছটার দিকে ধেয়ে গেল। কালো হয়ে ঝলসে গেল কুন্দের ঝোপটা।

ইভিলের আজ খুব অস্থির লাগছে। জানে না সে কী হয়েছে তার। শ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন। ফেব্রুয়ারি-মাসের এই কুয়াশামাখা রাতেও তার সারা শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছিল।

একসময় সে পৌঁছে গেল জঙ্গলের মধ্যে এক ছোটো জলাশয়ের কিনারায়। সেখানে একটা কাঁচা মাটির কবর ছিল। প্রতিরাতে মাংসের গন্ধে শেয়াল, শজারু কিংবা ভালুকেরা এই কবর খুঁড়ে ফেলে। ইভিল প্রতি ভোরে আবার নিজের হাতে মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করে যায়।

ইভিল বুঝতে পারে, বাবার জন্যে নয়; জন্তুগুলো মায়ের মাংসের লোভেই রোজ কবরটাকে খুঁড়ে ফেলে। কিন্তু তারপর যখন দেখে, মা ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তখন ভয়ে পালায়। বোকা জন্তু সব! শব্দ করে হেসে ওঠে ইভিল।

আজকেও কবরের গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে ইভিল দেখল, ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মাটির ঢেলার নীচে ওর বাবা-মার শরীরের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। মায়ের খয়েরি চুলের গুছি আর সবুজ চোখের মণি অন্ধকারেও জ্বলছিল। মায়ের মাংস, চামড়া সব যেমনকার তেমনই রয়েছে। দু-বছরে কিছুই বদলায়নি। কিন্তু বাবার শরীরে আর কিছু নেই —শুধু হাড়। ডাক্তারির ব্যাগটা ও বাবার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। সেটারও চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে। স্টেথোস্কোপের রাবারের নলদুটো গর্তের কিনারাতে দাঁড়িয়েও দেখতে পেল ইভিল।

কিছুক্ষণ চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে কী যেন ভাবল ইভিল। তারপর

শুধু আঙুলের বাঁকানো নখ দিয়ে ওই গর্তটার পাশে আর একটা প্রমাণ সাইজের নতুন গর্ত খুঁড়ে ফেলল সে।

এইসব করতে-করতেই সময় চলে গেল। কুয়াশা সরে গেল। পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ল বনের মাটিতে। ইভিল একটা গাছের পাচিল দিয়ে ঘেরা ছোটো ঘাসজমির ওপরে পাতার বিছানা পাতল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল কখন সে আসে।

*****

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তাই মাথার যন্ত্রণাটা আরও বেড়েছিল। সেইজন্যেই সকাল-সকাল স্নান করতে ঢুকেছিল তাহিতি। ঘুম থেকে উঠে তৃপ্তিদিকে দেখতে পায়নি। কাঞ্ছাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বড়োমেমসাব কোথায় গেলেন রে? দেখেছিস ওঁকে?

কাঞ্ছা ওর সামনে চায়ের পট সাজিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল, উনি কিছুক্ষণ আগে নদীর দিকে বেড়াতে গেলেন। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন বলে আর ডাকেননি। আমাকে বলে গেছেন, সাড়ে-আটটায় ফিরবেন। তার মধ্যে ব্রেকফাস্ট রেডি করে রাখতে।

তখন বেজেছিল সাড়ে-সাতটা। তাহিতি দেখেছিল এক-ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে তার স্নান, পোশাক বদলানো সবই হয়ে যাবে। ভেবেছিল তৃপ্তিদি ফিরলে দুজনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার দ্বিতীয় রাউন্ডে জঙ্গল ভ্রমণে বেরোবে। কিন্তু সাড়ে আটটার জায়গায় নটা বেজে গেল, তবুও তৃপ্তিদি ফিরল না। এখানে মোবাইল কাজ করে না। গভীর উদ্বেগ নিয়ে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বারবার নদীর দিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে সেদিকে তাকাচ্ছিল তাহিতি।

সাড়ে নটার সময় আর থাকতে না পেরে তাহিতি কাঞ্ছাকে ডাকল। বলল, বেরোতে হবে, চল।

—কোথায় যাবেন মেমসাব?

বড়ো মেমসাবকে খুঁজতে। তুই বাকি রান্নাবান্না ফিরে এসে করবি। আমার সঙ্গে চল।

কাঞ্ছা অল্প হেসে বলল, মিথ্যেই চিন্তা করছেন। এখানকার বনে বড়ো জন্তু-জানোয়ার কিছু নেই। সাপ এই শীতকালে বেরোয় না। আর কী হবে?

তাহিতি বলল, কত কী হতে পারে। দিদি হয়তো কোনো গর্তে পড়ে পা মচকিয়েছে। আমরা না গেলে উঠে আসতে পারছে না। এরকম হতে পারে কিনা বল।

কাঞ্ছা ঘাড় হেলাল। হ্যাঁ, হতে পারে।

তাহলে বাংলোর দরজায় তালা লাগিয়ে আয়। আমার সঙ্গে চল। জলদি।

শেষ কথাটা বলেই নিজের মনে জিভ কাটল তাহিতি। বেচারা ছেলেটাকে তাড়া দেওয়া উচিত নয়, জানে, তবু মনে থাকে না।

*****

খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চলল কাঞ্ছা। পেছন পেছন যেতে যেতে তাহিতি একবার ওকে জিজ্ঞেস করল, এলোমেলোভাবে খুঁজে কিছু লাভ আছে রে?

এলোমেলোভাবে খুঁজছি না তো, ওনার চিহ্ন ধরেই এগোচ্ছি। মাটিতে দেখুন, ওনার স্লিপারের ছাপ রয়েছে।

তা হবে। তাহিতি জানে, জঙ্গলে যে-ছেলে মানুষ হয়েছে, সে যা দেখতে পাবে, সে নিজে তা পাবে না। তাই কাঞ্ছাকে ফলো করে ও এগিয়ে চলল। বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে ওরা হঠাৎই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোটো ঘাসজমির সামনে এসে দাঁড়াল। কাঞ্ছা আঙুল দিয়ে জমিটার একটা দিকে নির্দেশ করে বলল, ওই দেখুন, বড়োমেমসাব।

তাহিতি দেখল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন দেখল, জমিটার একদিকে তৃপ্তি ঘোষালের শরীর পড়ে রয়েছে। এত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল সেই শরীরে প্রাণ নেই। আরও একটু কাছে গিয়ে তাহিতি বুঝতে পারল, তৃপ্তিদিকে রেপ করা হয়েছে। বুকে আর উরুতে দাঁত-নখের চিহ্ন দেখে অবশ্য প্রথমে সে ভেবেছিল, কোনো হিংস্র জন্তুই বোধহয় ওকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু রক্তাক্ত যোনি অন্য কথা বলছে।

কোথা থেকে যেন অসংখ্য মথ উড়ে এসে তৃপ্তিদির শরীরের ওপরে বসছিল। তাড়ালেও যাচ্ছিল না।

তাহিতি হাঁটু মুড়ে তৃপ্তিদির পাশে বসে ছিল। একট বাদে ও ঘাড় ফিরিয়ে অসহায় মুখে কাঞ্ছার দিকে তাকাল। ভাবছিল দেখবে কাঞ্ছাও একইভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাহিতি দেখল, কাঞ্ছা হাসছে। অদ্ভুত প্রসন্ন এক হাসি।

হাসতে-হাসতেই কাঞ্ছা এগিয়ে এল। বল, এক মিনিট মেমসাব। আমি একটা কাজ সেরে ফেলি। এই বলে সেই আঠেরো-উনিশ বছরের রোগা ছেলেটা অক্লেশে তৃপ্তিদির বডিটা দুহাতে তুলে নিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর তাহিতিকে ডাকল – আসুন, মাটি দিন।

তাহিতি উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। ওখানে বসে-বসেই ও দেখল কাঞ্ছা পায়ের মোজা খুলে ফেলেছে। হয়তো কবরে মাটি দেবার সময় ও খালি পায়েই সেটা দিতে চায়। ও মোজা খুলে ফেলেছে বলেই তাহিতি এখন, এই প্রথমবার ওর পায়ের পাতা দেখতে পেলো।

পাতা নয়, খুর। ছাগলের মতন। কিংবা শয়তানের মতন।

ইভিল ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাহিতিকে ডাকল –কী হল? আসুন!

আয়না বাগান



প্রায় পনেরোদিন বাদে আবার বাজারে এলেন নাড়ুগোপালবাবু। বেলেঘাটা রাসমণিবাজারে। পনেরোদিন আগে যখন এসেছিলেন তখন কেউ তার দিকে তাকিয়ে দেখেনি। তার আগেও কোনোদিন নয়, যদিও এই বাজারে তিনি বাজার করছেন তা হয়ে গেল ত্রিশ বছরের বেশি।

তাকিয়ে দেখবার মতন কেউ নন তিনি। অতি সাধারণ ছাপোষা লোক। বয়েস বাষট্টি। হাইট মাত্র সাড়ে-পাঁচফুট। ডায়াবিটিস আছে বলে মুখটা ফোলা-ফোলা কিন্তু হাত-পা কাঠিকাঠি। গায়ের রংটাও ফ্যাকাশে। চোখে মোটা কাচের চশমা। ফ্রেম আর ডাঁটির রং মোরগঝুঁটি ফুলের মতন কালচে লাল।

শুধু চেহারার জন্যে নয়। নাড়ুগোপালের চলাফেরা কিংবা কথাবার্তার মধ্যেও একটা নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখার প্রবণতা আছে। কেউ তাঁকে নজর করে না দেখলেই তিনি স্বস্তিতে থাকেন। ছোটোবেলা থেকে নানারকমের অপমানের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতেই তাঁর এই অভ্যেসটা তৈরি হয়েছে।

চল্লিশবছর আঁগে মামার জোরে নীলরতন সরকার হাসপাতালে পিয়োনের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে দু-বছর আগে রিটায়ার করেছেন। পুরো চাকরিজীবনটাই সহকর্মীদের প্রিয় মুরগি ছিলেন নাড়ুগোপাল। শুধু চেহারা আর স্বভাবই নয়, তাঁর ঠাকুমার দেওয়া নাড়ুগোপাল নামটাও মুরগি হবার পক্ষে খুব জুতসই ছিল।

আজ অবশ্য বাজারে অনেকেই তাঁর দিকে ঘুরে-ঘুরে তাকাচ্ছিল। সেটা বুঝতে পারছিলেন বলেই নাড়ুবাবু খুব আতান্তরে পড়ছিলেন।

সনাতনের মুদিখানার দোকানে তিনি বহুদিনের বাঁধা খদ্দের। অন্য সব দিনের মতোই আজও সনাতন নিজে দোকানের এক কোণায় টুলের ওপরে বসে ক্যাশ সামলাচ্ছিল আর ওর চারজন কর্মচারী খদ্দেরদের মাল দিচ্ছিল। মোট পাঁচটা লোক। পাঁচজনেই নাড়ুবাবুকে অনেকদিন ধরে চেনে কিন্তু কোনোদিন পাত্তা দেয় না। তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা খদ্দেরদের মাল দেয়। তারপর অনেকক্ষণ বাদে কেউ হয়তো দয়া করে বলে, বলুন দাদু, কী লাগবে?

নাড়ুবাবু এতে কিছু মনে করেন না। তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেন, লোকে আড়াইশো টাকা দিয়ে দাড়ি কামানোর রেজার কিনছে, আশি-নব্বই টাকা দিয়ে কমলা-সবুজ স্কোয়াসের বোতল, কর্নফ্লেক্স আরও কত দামি-দামি জিনিস কিনছে। ওদেরই তো আগে দেওয়া উচিত। তাঁর পালা এলে তিনি নীচু গলায় হাতের চিট কাগজ দেখে বলে যান সানলাইটের ছোট প্যাকেট একটা, বাতাসা আড়াইশো, ধুপকাঠি...। সবমিলিয়ে একশো টাকারও বিল হয় না কোনোদিন।

আজ কিন্তু নাড়ুবাবুকে চোখের কোণা দিয়ে একপলক দেখেই সনাতন খাড়া হয়ে বসল। একটা ছেলেকে হাঁক দিয়ে বলল, এই প্রশান্ত! দাদার কী লাগবে দেখ তো। দাদাকে আগে ছেড়ে দে। আপনি এই টুলটায় বসুন দাদা। হাত বাড়িয়ে কাউন্টারের বাইরে একটা টুল পেতে দেয় সনাতন। প্রশান্ত নামের ছেলেটা মোলায়েম-গলায় বলে, বলুন স্যার। কী দেবো? নাড়ুবাবু টুলে বসলেন না; কোনোরকমে পাঁচশোগ্রাম মুসুরির ডাল আর একটা একশোওয়াটের বাল্ব নিয়ে সনাতনের দোকান ছেড়ে অন্যদিকে পা বাড়ালেন। যেতে-যেতেই মনে পড়ল ব্লিচিং পাউডার নিতে ভুলে গেছেন। শিবানী কাল বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল।

আসলে তাঁর মনটা পড়েছিল খাতা-বইয়ের দোকানটার দিকে।

খাতা-বইয়ের দোকানটা বাজারের পেছনদিকের গলির মধ্যে। কেয়া যখন ছোট ছিল তখন ওর হাত ধরে অনেকবার দোকানটায় গিয়েছেন। ওর স্কুলে ওয়ার্ক-এডুকেশন বলে একটা ফ্যাচাং ছিল। মেয়েদের কখনও ফোটো-অ্যালবাম তৈরি করতে হত, কখনো গ্রিটিংস-কার্ড, কখনও গয়নার বাক্স। যতসব কাঁচকলা আর ঘোড়াড্ডিম। তো, সেইজন্যেই কেয়ার হাত ধরে এই দোকানটায় জরির ফিতে, চুমকি,

রঙিন কাগজ এইসব কিনতে আসতেন। আজ নাড়ুবাবুর মনে একটু ভয় ছিল, দোকানটা ইতিমধ্যে উঠে যায়নি তো?

না। আছে।

দোকানদার ভদ্রলোক অবশ্য গত দশবছরে অনেকটাই বুড়ো হয়ে গেছেন। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। নাড়ুগোপালকে দেখে, চিরতা-খাওয়া মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কী লাগবে?

নাড়ুগোপালের মনে হল, সমবেদনার থেকে এই অপরিচয় ভালো। অনেকক্ষণ বাদে তিনি একটু সহজ হলেন। তাঁর গলায় একটু জোর ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলেন, রথের কাগজ আছে?

দোকানদার মিনিট খানেক চুপ করে নাড়ুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন —এই পৌষমাসে রথের কাগজ? চাইছেন কী, ঠিক করে বলুন তো।

—আরে, ওই লাল-নীল কাগজ হয় না, চকচকে মতন, কী যেন বলে?

—মার্বেল-পেপার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। মার্বেল-পেপার। তাড়াহুড়ো করে বলে ওঠেন নাড়ুবাবু। কেয়াকে অনেকবার কিনে দিয়েছেন। কিন্তু সে তো ন-দশবছর আগের কথা। সেইজন্যেই মার্বেল-পেপার নামটা মনে পড়ছিল না।

তিনি বললেন, একটা সবুজ আর একটা লাল মার্বেল-পেপার দেবেন। আর আঠা এক শিশি। গঁদের আঠা নয়, বেশ জোরালো... কাচ জোড়া যায় এরকম।

টাকা মিটিয়ে জিনিসগুলো হাতের নাইলনের থলিতে ভরে বেলেঘাটা রোড ধরে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন নাড়ুবাবু। তাঁকে আর শুধু একটা দোকানেই দাঁড়াতে হবে। দোকানটা তাঁর বাড়ি ফেরার রাস্তাতেই পড়বে। বাসুদেবের ফোটো বাঁধানোর দোকান। বাসুদেব লোকটার সঙ্গে নাড়ুবাবুর একটু খাতির রয়েছে কারণ ও এন. আর. এস হাসপাতালে ছোটোখাটো কন্ট্র্যাকটরির কাজ করত; জানলায় কাচ-টাচ লাগানোর কাজ। তখন থেকেই নাড়ুবাবুকে চেনে।

বাসুদেব দোকানে একাই ছিল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটা মোটা পিজবোর্ডকে সাইজ করে কাটছিল। খেয়াল করেনি নাড়ুবাবু কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। নাড়ুবাবু আস্তে করে গলা খাঁকারি

দিলেন। বাসু মুখটা ঘুরিয়ে নাড়ুবাবুকে দেখেই যেন জমে পাথর হয়ে গেল। তারপর কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আসুন দাদা, ভেতরে আসুন। ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন।

বলুন দাদা, কী লাগবে। একটা নোংরা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে-মুছতে এগিয়ে এলো বাসুদেব। নাড়ুগোপাল মনে-মনে ভাবলেন, কেয়া মরে গিয়ে তাকে বিখ্যাত করে দিয়ে গেছে। এখন কিছুদিন লোকে তাকে চেয়ার এগিয়ে দেবে। লাইনে দাঁড়াতে দেবে না; সবার আগে সার্ভিস দেবে তাকে। তারপর আবার ভুলে যাবে।

বাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে হাসলেন নাড়ুগোপাল। বললেন, একটা ঝামেলার কাজ আছে ভাই। তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব? এই বলে তিনি কাঁধের রংচটা শান্তিনিকেতনি ঝোলাটার মধ্যে থেকে একটা খবরের কাগজের মোড়ক বার করলেন। তারপর মোড়কটাকে বাসুর কাজের টেবিলের ওপরে রেখে আস্তে-আস্তে একটার পর একটা কাগজের পাতা সরিয়ে-সরিয়ে বার করলেন তিন-টুকরো কাচ।

বাসুদেব ঝুঁকে পড়ল কাচগুলোর ওপরে। এক একটা কাচের টুকরো প্রায় ছ'ইঞ্চি লম্বা। দেখলেই বোঝা যায়, কোনো বড়ো কাচের পিসের থেকে ওগুলো ভেঙে পড়েছে— যে কারণে সবকটারই ওরকম আঁকাবাঁকা শেপ। জানলার শার্সি-টার্সি ভাঙলে যেরকম কাচের স্পলিনটার ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, সেইরকম। বাসু বলল, এ বাবা। এই টুকরোগুলো নিয়ে ঘুরছেন কেন? হাত-ফাত কেটে যাবে যে।

না না। আমি খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করি। তোমাকে যেটা করতে হবে, এই প্রত্যেকটা টুকরো থেকে আমাকে একটা করে বেশ চৌরস পিস কেটে দিতে হবে। তিনটে পিস – প্রত্যেকটার লেংথ হবে এই ধরো চার ইঞ্চি আর চওড়া দেড়-ইঞ্চি। পারবে না?

বাসু বললো, সে পারব না কেন? কিন্তু এরকম কাচ তো আমার দোকানে ভরতি। ওই দেখুন, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে। আমি পরিষ্কার নতুন কাচ থেকে আপনাকে তিনটে টুকরো কেটে দিচ্ছি, নাড়ুদা। আপনি এই নোংরা কাচগুলো ফেলে দিন।

বাসুর কথা শুনে নাড়ুগোপাল এমনভাবে টুকরোগুলোকে খামচে

ধরলেন যে, মাঝখানে খবরের কাগজের মোড়কটা না থাকলে অবশ্যই হাত কেটে রক্তারক্তি হত। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, না না, ফেলা যাবে না... ফেলা যাবে না। তুমি না পারলে আমি অন্য কোথাও থেকে... এই বলে উঠেই পড়ছিলেন। বাসু আটকালো। দিন, দিন। আমি করে দিচ্ছি।

বেশিক্ষণ লাগল না। নাড়ুগোপালের চাহিদা মতন ভাঙা কাচের টুকরোগুলো থেকে তিনটে সুন্দর চৌরস পিস বার করে দিল বাসু। আবার গ্রাইন্ডিং-হুইলে ঘষে কাচের কোণাগুলোকে ভোঁতাও করে দিল, যাতে হাত না কাটে। তারপর সেগুলোকে একটা পিচবোর্ডের বাক্সে পুরে নাড়ুগোপালের হাতে ধরিয়ে দিল।

নাড়ুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কত দেবো? মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বাসু। নাড়ুবাবু যখন দোকানঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন সে কিন্তু-কিন্তু করে প্রশ্ন করল, শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটল নাড়ুদা?

হ্যাঁ ভাই – সুতির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে উত্তর দিলেন নাড়ুবাবু। মিটল। দুজনেরই।

দুজনের মানে! বাসুর মুখটা হা হয়ে গেল। আমরা তো শুধু কেয়ার কথাই জানতাম।

পেটে বাচ্চা ছিল জানতে না? ছ'মাসের ওপর হয়ে গিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে আলাদা করে মা আর পেটের বাচ্চার সৎকার করতে হয়। আলাদা করে শ্রাদ্ধ করতে হয়। সে অনেক নিয়ম। আমিও জানতাম না।

স্তম্ভিত বাসুদেব উত্তর দিতে পারল না। শুধু দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আপনমনে মাথাটা কয়েকবার নাড়ল। ওখানে দাঁড়িয়েই সে দেখল, নাড়ুগোপাল নামে পাড়ার অকালবৃদ্ধ বাসিন্দাটি বেলেঘাটা রোড থেকে সুরেন নস্কর লেন ধরে মুন্সীপাড়ার দিকে বাঁক নিচ্ছেন।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার – ভাবলো বাসুদেব – যতটা ভেঙে পড়ার কথা, ততটা বিধ্বস্ত কিন্তু লাগছে না নাড়ুদাকে। ওই যে উনি যাচ্ছেন, পায়ের প্রতিটি স্টেপ-এর মধ্যে কেমন যেন একটা হালকা তুড়িলাফ গোছের ব্যাপার আছে। যেন... যেন একটা বাচ্চা ছেলে বিকেলে খেলার মাঠে যাচ্ছে।

অথচ লোকটার একমাত্র মেয়ে এই মাসের শুরুতেই গলায় দড়ি দিয়েছে।

*****

খেলার মাঠ একটা ছিল সত্যিই। মনে-মনে সেই মাঠটার দিকেই দৌড়চ্ছিলেন নাড়ুবাবু।

না, নাড়ুবাবু নন। গোপাল দৌড়চ্ছিল, গোপাল। তার বয়স এখন দশ। সে বেলেঘাটা খালপাড়ের একটা বস্তিতে থাকে। তার মা সাহাবাবুদের প্লাইউডের কারখানার লেবার।

কদম কিংবা গামারগাছের গুঁড়ি থেকে মেশিনে ছুলে-নেওয়া পাতলা পিসগুলোকে বলা হয় ভিনিয়ার। একটার ওপরে একটা ভিনিয়ার চাপিয়ে, কেমিকাল বাইন্ডার লাগিয়ে, মেশিনে প্রেস করে প্লাইবোর্ড তৈরি করা হয়।

গোপালের মা আর গোপাল দুজনে মিলে সকালবেলায় খালপাড়ের রাস্তার ধারে রাশি-রাশি ভিনিয়ার রোদ্দুরে শুকোতে দিয়েছিল। এখন এই বিকেলবেলায় ওরা শুকনো ভিনিয়ারগুলোকে থাকবন্দি করে গুছিয়ে তুলছে। এগুলোকে সাহাবাবুর কারখানায় পৌঁছে দিলে ওরা মজুরি পাবে।

এতক্ষণ গোপাল নিজেও মার সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাজ করছিল। কাজটা ভালো না লাগলেও করতেই হয়, কারণ ওর বাবা বছরখানেক হল অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে ঘর বসিয়েছে। দেহাতি মেয়েটার নাম এতোয়ারি। বয়সে ওর মায়ের চেয়ে কিছুটা বড়োই হবে কিন্তু রংঢং খুব। বাঁধনি শাড়ি, হাত ভরতি কাচের চুড়ি, চিবুকে তিনটে উল্কির ফোঁটা। মা বলে খানকি মাগি। বাবা আর এতোয়ারির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় গোপালের। ওরাও তো সাহাবাবুর কারখানাতেই কাজ করে। থাকেও এই বস্তিরই অন্য একটা দিকে।

হঠাৎই ওর মতন সাত-আটটা ছেলেমেয়ে বস্তি থেকে বেরিয়ে হইহই করতে করতে ওদের ঠিক পেছন দিয়ে পুবদিকে চলে গেল। গোপাল ছেঁড়া হাফপ্যান্টের পেছনে হাত মুছতে-মুছতে করুণমুখে বলল, যাই মা?

ওর মা পেছনে না তাকিয়েই বলল, সে তো যাবেই বাবা। হনুমানের পাল যখন বেরিয়ে পড়েছে, তখন তোমাকে কি আর আটকে রাখতে পারব? তবে বেশি দেরি করবে না। তা হলে পিঠে কঞ্চি ভাঙব।

গোপাল আর একটুও সময় নষ্ট না করে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে ওদের দলে ঢুকে পড়ল।

ছিপি, দারিয়াবান্ধা, কাগজের বল দিয়ে ফুটবল — ওসব কিছু নয়। দশ-বারোদিন হল, বেলেঘাটা মুন্সীপাড়া-বস্তির বাচ্চারা অন্য একটা খেলা খুঁজে পেয়েছে। পুবদিকের নীচু জমিটায় মাসখানেক আগে থেকে লরি ভরতি করে আবর্জনা এনে ফেলা হচ্ছে। শয়ে-শয়ে লরি সারাদিন ধরে ময়লা ফেলছে ওখানে। গোপালের মা বলছিল, ওখান দিয়ে বিশাল এক রাস্তা তৈরি হবে। সেই স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে থেকে নানান ইন্টারেস্টিং জিনিস খুঁজে বার করাটাই গোপালদের নতুন খেলা।

খুঁজলে পাওয়াও যায় অনেককিছু। বাচ্চারা পায়।

বাতিল রিক্সার টায়ার পেলে সেগুলোকে কাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে বস্তির রাস্তায় দৌড় করানো যায়। ভাঙা বোতল-টোতলগুলো ওরা জমিয়ে রাখে, পরে ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবে বলে। লোহার চৌকোনা টুকরো খুঁজে পেলে সেগুলো ওদের ছিপি খেলার কাজে লাগে, কিন্তু তামা, কাঁসার মতন অন্য কোনো মেটা্লের টুকরো খুঁজে পেলে সেগুলো ওরা বাবা-মার হাতেই তুলে দেয়। বাবা-মারা খুশি হয়। ওগুলোর নাকি খুব দাম, যদিও পাওয়া যায় অল্প।

তাছাড়া আরো কোন অমূল্য রতন যে কখন পাওয়া যাবে তা কেউ বলতে পারে না। কদিন আগে গোপাল একটা প্রায় নতুন খেলনা পেয়েছিল – কাঠের টুকরোর ওপরে ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি। টুকরোগুলোকে পাশাপাশি জোড়া লাগাতে পারলে ছবিটাও গোটাগুটি দেখতে পাওয়া যায়। দুয়েকটা টুকরো হারিয়ে গিয়েছিল। তাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

এতরকমের মজার সঙ্গে যোগ হয়েছে একটা নতুন মজা। সেটা শুধু গোপালই জানে। সে ওই জঞ্জালের প্রান্তরের এক কোণায় একজন ম্যাজিসিয়ানকে খুঁজে পেয়েছে। দেখলে মনে হয় ভিখিরি। তাদের চেয়েও গরিব। কিন্তু আসলে ছদ্মবেশী ম্যাজিকওলা।

লোকটা বুড়ো। বেশ বেঁটে। কেমন যেন ফোলা-ফোলা চোখমুখ কিন্তু কাঠি-কাঠি হাত পা। চোখে মোটা কাচের চশমা, ফ্রেম আর ডাঁটির রং মোরগঝুঁটি ফুলের মতন কালচে লাল। লোকটার কাছে একটা

দূরবিনের মতন খেলনা আছে, যেটার কাচে চোখ লাগালে ভেতরে অনেক ফুল আর আল্পনা দেখা যায়।

ও গোপালকে একদিন খেলনাটা চোখে লাগিয়ে দেখতে দিয়েছিল। গোপালের ইচ্ছে করছিল রংচঙে পাইপের টুকরোর মতন জিনিসটাকে নিয়ে পালায়। গোপাল তার আগে অনেকবার চার-আনা পয়সা দিয়ে বায়োস্কোপওলার বাক্সের ফুটোতে চোখ লাগিয়ে ভেতরের ছবি দেখেছে। কিন্তু ওই দূরবিনটাকে তার বায়োস্কোপের চেয়েও সুন্দর মনে হয়েছে।

কেন মনে হবে না? পাইপটাকে একটু ঘোরালেই ভেতরের আলোর আল্পনাগুলো কেমন পালটে যাচ্ছিল। ধরো এতক্ষণ ছিল একশোটা সূর্যমুখী ফুল। সামান্য ঘোরাতেই সেগুলো হয়ে গেল জবা। আর একটু ঘোরাতেই গোলাপ। আর শুধুই কি তাদের পাপড়ি বদলালো? উঁহু। বদলে গেলো বেবাক রং। ছিল সোনালি পাপড়ি, গোলাপি পরাগ। হল গোলাপি পাপড়ি, সোনালি রেণু।

সেদিন গোপালের অন্য বন্ধুরা যখন টায়ার-ফায়ার কুড়োতে এদিক-ওদিক চলে গেল তখন গোপাল পা টিপে-টিপে ভাগাড়ের সেইদিকটায় চলল, যেদিকে আগের দিন সে বুড়োকে দেখেছিল। আন্না বলে মেয়েটা ওকে দেখে ফেলেছিল অবশ্য। জিজ্ঞেস করেছিল, অ্যাই গোপাল। ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে?

গোপাল বলেছিল, পেচ্ছাপ করে আসি। আন্না অবাক হয়েছিল ঠিকই —পেচ্ছাপ করার জন্যে কাকে আর দূরে যেতে হয় – তবে আর কিছু না বলে অন্যরা যেদিকে লোহার রড দিয়ে ময়লা খুঁড়ছে, সেইদিকে চলে গিয়েছিল। গোপালও নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। সে আসলে আর কাউকে জানাতে চায়নি বুড়োর কথা।

সেদিনও বুড়োটা একটা জঞ্জালের ঢিবির আড়ালে ছেঁড়া প্লাস্টিক বিছিয়ে বসেছিল। একমনে দূরবিনের মতন খেলনাটাকে চোখের কাছে নিয়ে কী যেন করছিল। দূর থেকেই গোপাল দেখতে পেয়েছিল বুড়োর একহাতে একটা সন্না ধরা আছে। ওই সন্নাটা দিয়ে বুড়ো দূরবিনের নলের ভেতরে খুব সাবধানে কী যেন একটা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল।

সেদিন শেষ-বিকেলের আলোয় তিনফুটিয়া গোপালের ছায়া লম্বা হতে-হতে বুড়োর কোলে গিয়ে পড়তেই বুড়ো চমকে উঠে দূরবিনটাকে

হাঁটুর তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল। আর সন্নাটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সামনে পেতে রাখা একটা রংচটা শান্তিনিকেতনি ঝোলার ভেতরে। তারপর অবশ্য গোপালকে দেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, ও তুই! জানতাম আসবি।

—কেমন করে জানলে? গোপাল প্রশ্ন করেছিল।

বুড়ো বলেছিল, তোর ছায়া দেখে। খেয়াল করে দেখবি, তোর নিজের ছায়ার সঙ্গে আরও একজনের ছায়া মিশে আছে। যম। যমের ছায়া পড়েছে তোর শরীরে।

যেহেতু গোপালের বয়স তখন মাত্রই দশ, কাজেই সে ওসব কথা শুনে বিচলিত হয়নি। বরং খুশিই হয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, বুড়োটা পাগল। আর পাগলদের কাছ থেকে কোনো জিনিস বাগিয়ে নেওয়া যে সহজ, সেটা বস্তির ছেলে হিসেবে সে ভালোই জানত। ওদের বেলেঘাটা বস্তিতে পাগলের অভাব নেই।

কাজেই গোপাল বুড়োর সামনে উবু হয়ে বসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে দূরবিনটা দেবে? কত দাম?

বুড়ো তাই শুনে খ্যা খ্যা করে খুব একচোট হেসেছিল। বলেছিল, দূরবিন কীরে যমের অরুচি! এর নাম ক্যালাইডোস্কোপ। কিনতে পাওয়া যায় বটে, তবে সেগুলো ভালো হয় না। এটা আমি নিজের হাতে বানিয়েছি।

তাই শুনে গোপাল আরোই চেগে উঠেছিল। বলেছিল, আমি পারব বানাতে? শিখিয়ে দেবে আমাকে?

শেখানো তো বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হল ভেতরে কী ভরবি। যেমন যেমন মাল-মেটিরিয়াল ঢোকাবি সেইরকমই ছবি তৈরি হবে কিনা।

গোপাল ততক্ষণে আড়চোখে দেখে নিয়েছে ঝোলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বিঘৎখানেক লম্বা সেই সন্নাটা, যেটার ডগায় তখনো আটকে ছিল একটা হাতের আঙুল। উপরন্তু তার চোখে পড়েছিল, আঙুলটার গাঁটে তখনও একটা ঝুটো রুপোর আঙটি আটকে আছে। গোপালকে চেয়ে থাকতে দেখে বুড়ো আঙুলটাকে টপ করে দূরবিন... না না... ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে চালান করে দিয়ে বলল, যা যা! খেলগে যা।

গোপাল জোরে-জোরে দুদিকে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিল, ওসব খেলাটেলা বাদ দাও না। তুমি আমাকে বলো, কী নিয়ে আসতে হবে; আমি এনে দেব। তখন তুমি আমাকে ক্যাডাস্কোপ বানানো শিখিয়ে দিয়ো।

ক্যাডাস্কোপ নয়, ক্যালাইডোস্কোপ। চকচকে জিনিস নিয়ে আসবি। যেগুলো আয়নার গায়ে রিফ্লেক্টেড হলে ভালো দেখতে লাগবে।

গোপাল একটু ভেবে নিয়ে বললো সিগ্রেটের রাংতা হলে চলবে?

উঁহু। জড়িয়ে যাবে।

তাহলে কাচের চুড়ি?

বুড়ো কেমন যেন ছলছলে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, সাবাশ। বললাম না, যমের ছায়া পড়েছে তোর ওপরে। চিন্তা করিস না। পেয়ে যাবি। যা এবার বাড়ি যা। কাল নয়, পরশু এখানে চলে আসিস। আমি তোকে ক্যালাইডোস্কোপ বানানো শিখিয়ে দেব।

সেদিনই গোপাল, মানে আমাদের আজকের নাড়ুগোপাল বাড়ি ফেরার পথে একবার সাহাবাবুদের কারখানায় ঢুকেছিল। ও জানতো, ওইসময়টায় কারখানায় আর কেউ থাকে না। শুধু ওর বাপের নতুন বউ এতোয়ারি কেরোসিন-তেলে কাপড় ভিজিয়ে মেশিনগুলোকে মোছামুছি করে।

গোপালকে ঢুকতে দেখে এতোয়ারি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বলেছিল, ক্যারে গোপালোয়া। তানি হলচল সব ঠিকেই হৈ না? গোপাল দেয়ালের সুইচ-বোর্ডের ওপরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতদুটো পেছনে ভাঁজ করে রেখে বলেছিল, সব ঠিক আছে। ওই দেখো, ওইখানটায় ময়লা লেগে আছে —ওই ব্লেডের নীচটায়।

ওই রাতেই আর একবার গোপালকে কারখানায় আসতে হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে। প্রথমে ওর মা হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে-কাঁদতে ঘর খোলা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল। গোপাল বেরোলো মিনিট-দশেক বাদে। ধীরেসুস্থে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে, চাবিটা পকেটে পুরে হাঁটা লাগাল সাহাবাবুদের কারখানার দিকে। তখনো বস্তির অনেক লোক কারখানার দিকে দৌড়চ্ছিল। তাদেরই একজনকে গোপাল জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

লোকটা মুখ না ফিরিয়েই বলল, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে রে। জলদি চল।

ওদের সঙ্গেই গোপাল পৌঁছিয়ে গেল সাহাবাবুদের প্লাইবোর্ডের কারখানার ভেতরে। কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি বড়ো গেটটা পেরোলেই পেটা-মাটির মেঝে। একদিকে কংক্রিটের বেদি। বেদির ওপরে গাঁথা আছে বিরাট শিয়ারিং-মেশিন, যে মেশিনের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে কদম কিংবা গামারের গুঁড়িকে আটকে দিয়ে মেশিন চালিয়ে দিলে আটফুট লম্বা ধারালো ব্লেড সেই গুঁড়ির গা থেকে পরতের পর পরত ছাল ছাড়াতে-ছাড়াতে গুঁড়িটাকে পাঁচমিনিটের মধ্যে রোগা করে দেয়। ওই ছাল দিয়ে ভিনিয়ার তৈরি হয়।

ঠিক যাত্রার আসরের মতন লাগছিলো জায়গাটাকে। কারখানার টিনের ছাদ থেকে জোরালো একটা বাল্ব ঝুলছিল। সেই বাল্বের বিশাল আলোকবৃত্তের মধ্যিখানে দানবের মতন হামাগুড়ি দিয়ে বসেছিল শিয়ারিং-মেশিনটা। তার গাঢ় সবুজ চামড়া, ঝকঝকে দাঁত। আর মেশিনটার ঠিক পায়ের কাছে শুয়েছিলো এতোয়ারি।

এখনো মনে আছে গোপালের —এতোয়ারি যেন একটু কাত হয়ে, বাঁ হাতের ভাঁজের মধ্যে মুখটাকে ঢুকিয়ে ঘুমোচ্ছিলো। কিন্তু ওর কনুই থেকে ডানহাতের পুরোটাই ধরা ছিলো মেশিনের দাঁতে। তখনো সেই কাটা হাতের আঙুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছিল।

ও হ্যাঁ। ওই মঞ্চেরই একপাশে গোপালের বাবাও বসেছিল। হতভম্ব মুখ। মাঝেমাঝে গামছা দিয়ে মুখ মুছছিল আর মাথাটাকে এদিক থেকে ওদিকে নাড়াচ্ছিল।

একটু বাদে, প্রায় একইসঙ্গে পুলিশের জিপ, সাহাবাবুদের সাদা গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছিল কারখানার গেটে। তখন আবার পুরো ভিড়টাই হুড়হুড় করে বাইরের দিকে দৌড়েছিল। ওইসময়ে কিছুক্ষণ কারখানার ভেতরে ছিল কেবল গোপাল আর মৃতা এতোয়ারি। তখনো গোপাল ওর মাকে খুঁজে পায়নি। তবে ও জানতো মাকে কোথায় পাবে।

কারখানার কম্পাউন্ডটাকে একটা বেড় দিয়ে সে পৌঁছে গেলো পেছনের দিকে —খালের ধারে। জায়গাটা অন্ধকার। ভনভন করে মশা

উড়ছিল। ওখানেই একটা মড়া গাছের গুঁড়ির ওপরে বসেছিলো ওর মা। গোপালের পায়ের শব্দ পেয়ে মা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর হাত বাড়িয়ে গোপালকে বুকে টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। যেন কাঁদবার সময় একটা অবলম্বন লাগবে বলেই গোপালকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল মা।

মা কাঁদছিল আর ফিসফিস করে বলছিলো, এরকম মরণ আমি চাইনি। আমাকেই সবাই দূষবে, কিন্তু ঠাকুর জানে, মেয়েটার এরকম বীভৎস মরণ আমি চাইনি।

পরের দিন দুপুরের দিকে গোপাল গিয়ে হাজির হয়েছিলো ময়লা ফেলার মাঠে। বুড়োটা যেখানটায় বসে থাকে সেখানেই বসেছিলো। সে যেমন জানতো গোপাল আসবে, গোপালও জানতো বুড়ো থাকবে।

গোপালের দিকে একপলক তাকিয়ে বুড়ো বলেছিল, এনেছিস?

গোপাল ঘাড় হেলালো। তারপর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো ভাঙা কাচের চুড়ি বার করে বুড়োর হাতে দিল।

বুড়ো একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে চুড়ির টুকরোগুলোর গা থেকে এতোয়ারির শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগগুলো মুছতে-মুছতে বলল, আয়! আমার পাশে বোস। এই দেখ। এটা পিজবোর্ডের পাইপ। এই তিনটে আয়নার টুকরো আর...।

ওই শেষ। তারপরে আর কোনোদিন সেই ম্যাজিকওলাকে দেখতে পায়নি গোপাল।

*****

নাড়ুগোপালের বউ শিবানী চৌকির ওপরে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে শুয়েছিল। ঘুমোচ্ছিল কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। আজকাল প্রায় চব্বিশঘণ্টাই ওইভাবে শুয়ে থাকে। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ, দরজা দিয়ে মেঝের ওপরে যেখানে একটু আলো এসে পড়েছে সেখানেই একটা পুরোনো বেড-কাভার পেতে, সামনে অনেকগুলো জিনিস সাজিয়ে নিয়ে বসেছিলেন নাড়ুগোপালবাবু।

জিনিসগুলোর মধ্যে পিজবোর্ড ছিল, মার্বেল-পেপার ছিল, বাসুদেবের কেটে-দেওয়া তিনটে কাচের টুকরো ছিল আর ছিল একটা পুরোনো খবরের কাগজ।

চোখের কাছে কাগজের একটা পাতা তুলে এনে কিছুক্ষণ মন দিয়ে ডানদিকের কলমের একটা ছোট খবর পড়লেন নাড়ুবাবু। আলো কম, তাই চশমাটাকে দু-একবার আগুপিছু করলেন। খবরটা ছিল এইরকম—

'গতকাল দুপুরে উত্তর কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম লেনের এক বাড়িতে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়। মৃতার নাম কেয়া সামন্ত। বয়স চব্বিশ। তিনি শাসকদলের স্থানীয় কাউন্সিলর স্বপন সামন্তের স্ত্রী। বিরোধীদের বক্তব্য ছিল এটি আত্মহত্যা নয়, হত্যা। কিন্তু লোকাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান, কেয়াদেবী নাকি দীর্ঘকাল মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এবং এর আগেও তিনি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। মৃতার আত্মীয়স্বজনের তরফেও থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলেই তারা জানান।'

এর পরেও আরো কিছু লেখা ছিল, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট টিপোর্ট নিয়ে। তবে নাড়ুবাবু সেগুলো আর না পড়েই ফালি-ফালি করে খবরের কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর গঁদের আঠা দিয়ে কাচের পেছনে পুরু করে সেই কাগজের ফালিগুলো চিটকোতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ বাদে একটা একটা করে তিনটে কাচের টুকরোই চোখের সামনে তুলে ধরে তিনি দেখলেন— যেদিকে কাগজ সেঁটেছিলেন তার অন্য পাশটা আয়নার মতন ঝকঝক করছে। দিব্যি ছায়া পড়ছে কাচের টুকরোগুলোর গায়ে। এইভাবে যে আয়না বানানো যায়, সেটা ওই বুড়োই তাকে শিখিয়েছিল।

আর একটা জিনিস তাকে শিখিয়েছিল সেই ভাগাড়ের বুড়ো। সেটা হচ্ছে, এই ক্যালাইডোস্কোপ জিনিসটাকে যদি ঠিক মতন তৈরি করা যায়, তাহলে এ নিজের পেট ভরানোর ব্যবস্থা নিজেই করে নেয়; যেমন অনেকবছর আগে ভাগাড়ের বুড়োর ক্যালাইডোস্কোপ চেয়েছিল ভাঙা কাচের চুড়ি।

নাড়ুগোপাল খুব আদর করে আয়নার ফালিগুলোর গায়ে হাত বোলালেন। ব্যাটা বাসুদেব এগুলোকে ফেলে দিতে চাইছিল। আরে,

এগুলো কি সাধারন কাচের টুকরো, যে ফেলে দেবে? এগুলো তিনি কেয়ার শ্বশুরবাড়ির পেছনের ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে এনেছেন। প্রত্যেকটার গায়ে এখনও কেয়ার রক্ত লেগে আছে। মেয়েটা মরবার আগে লড়াই করেছিল। স্বপনের সঙ্গে তো বটেই, খুব সম্ভবত ওদের পার্টির সেই এম. এল. এর সঙ্গেও, যার বাচ্চা কেয়ার পেটে ছিল। দোতলার ঘরের জানলার কাচ ভেঙে লাফ দিতে চেয়েছিলো বোধহয় মেয়েটা।

ওকে আর শিবানীকে দেখে স্বপনের আর ওর মায়ের সেকি কান্না সেদিন। নাড়ুবাবুর মনে পড়ে, তাঁর নিজের চোখও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল বারবার। তাই স্বপন যখন সাদা-কাগজটা বাড়িয়ে ধরে চোখ মুছতে-মুছতে বলেছিল একটু সই করে দিন বাবা, কেয়ার তো বার্থ-সার্টিফিকেট ছিল না, আপনারা বাবা মা হিসেবে জন্মের দিনটা একটু সার্টিফাই করে দিন, তখন তিনি আর কিছু দেখেননি। সই করে দিয়েছিলেন। শিবানীও তাই করেছিল। পরে তো ওই কাগজেই কেয়াকে ডিপ্রেসনের রুগি-টুগি বলে... ভাবা যায়? তিনি নাকি লিখে দিয়েছেন, কেয়া বারবার সুইসাইড করতে চাইত।

যাগগে যাগগে! ওসব পুরোনো কথা ভেবে মন খারাপ করার দরকার নেই। নাড়ুবাবু একবার ঘাড় বাড়িয়ে খাটের দিকে তাকালেন। শিবানী একইভাবে শুয়ে আছে। ওই মানুষটাকে যে কীভাবে একটু চাঙ্গা করে তোলা যায়, সেটাই তিনি বুঝতে পারছেন না।

নাড়ুবাবু আবার কাজে মন দিলেন। পিজবোর্ড পাকিয়ে একটা চোঙা বানালেন। তার মধ্যে টাইট করে বসিয়ে দিলেন তিন-ফালি আয়না। একটা কাল্পনিক ত্রিভূজের তিনটে বাহুর ওপরে তিনটে আয়না দাঁড়িয়ে রইল। মাঝখানের তেকোনা জায়গাটাই আয়না-বাগান। ওইখানেই বীজ ফেললে ফুল ফুটবে।

কেয়ার পেটের বাচ্চাটা ছিল একটা মেয়ে। অনেকটাই বড়ো হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। যদিও তার বাবা যে কে, স্বপন না সেই এম. এল. এ, তা জানেন না নাড়ুবাবু, তবু এটা তো ঠিক যে সে কেয়ারও মেয়ে। তাই সেই না-হওয়া নাতনিটার একটা নাম দিয়েছেন তিনি। কুসুমকুমারী।

এখনো কাজ শেষ হয়নি, তবু অর্ধসমাপ্ত ক্যালাইডোস্কোপটা চোখে

লাগিয়ে নাড়ুবাবু দেখলেন তিনকোনা আয়না-বাগানের ঠিক মাঝখানে কুসুমকুমারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোনালি ফ্রক, একরাশ চুলে লাল প্রজাপতি ফিতে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চা মেয়েটা এদিক-ওদিক চাইছে। যেন লুকোচুরি খেলতে নেমে ওর বন্ধুরা এমন ভাবে লুকিয়ে পড়েছে যে, ও আর কিছুতেই তাদের খুঁজে পাচ্ছে না।

একটু বাদে ওর ঠোঁট দুটো ফুলে উঠল। নাড়ুবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, দাঁড়া দাঁড়া। আমি তোর বন্ধুদের খুঁজে আনছি। কাঁদিস না দিদি।

খাটের ওপর থেকে শিবানী খুব বিরক্ত গলায় বলল, সারা দুপুর কি ফিশফাশ খুটুর খাটুর করছ? একটু শুয়ে নিলে পারতে তো।

*****

মেঘনা চোখ থেকে ক্যালাইডোস্কোপ-টা নামিয়ে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকালো।

দশবছরের মেয়েটার উড়োঝুরো চুলে ঘেরা সুন্দর মুখে আর বড়ো বড়ো দুটো চোখে ফুটে উঠেছে রাজ্যের বিস্ময়। ও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল, সবকিছু আগের মতন রয়েছে কি না। হ্যাঁ, ওই তো - ঘরের দেয়ালে কুকু-ক্লক আর পাহাড়ের ছবিওলা ক্যালেন্ডার। জানলার পাশে বাবার কম্পিউটার টেবিল। তার পাশে বুক-কেস।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো মেঘনা। সেখানেও কিছুই বদলায়নি। ল্যাম্পপোস্টের মাথায় সেদিন যে ঘুড়িটা উড়ে এসে আটকে গিয়েছিল সেটা এখনো এদিক-ওদিক পাক খাচ্ছে। উলটোদিকের ফ্ল্যাটের বন্দনা-আন্টি ব্যালকনিতে একটা টাওয়েল মেলে দিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। সবই তো ঠিক আছে। তাহলে ক্যালাইডোস্কোপের ভেতরে একটু আগে কী দেখল সে?

মেঘনা খুব ভয়ে ভয়ে, খুব সাবধানে, আবার তার নতুন পাওয়া খেলনাটা তুলে চোখের সঙ্গে লাগালো। কাঁপা কাঁপা হাতে একটু ঘুরিয়ে দিল রঙিন কাগজে মোড়া পিজবোর্ডের সিলিন্ডারটা। ওই তো, ঠিক আগের মতোই আই-পিসের ওদিকে কাচের টুকরোগুলো কী সুন্দর তিনটে আয়নায় রিফ্লেক্টেড হয়ে একশো পাপড়ির ফুল ফুটিয়ে দিল। মেঘনার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল।

আবার সিলিন্ডারটাকে একটু ঘুরিয়ে দিল মেঘনা। ফুলগুলোর রং, ডিজাইন সব ম্যাজিকের মতন পালটে গেল। সে মনে-মনে ভাবলো, তাহলে কী দেখলাম একটু আগে!

মেঘনা ঠিক করল, এবার থেকে মা যেমন বলে, দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেবে। না ঘুমোনোর জন্যেই নিশ্চয়ই ভুল দেখছি, সে ভাবল।

ওর হাতের পাতাদুটো ঘামে ভিজে গিয়েছিল। ফ্রকের পাশে ভালো করে ঘষে ঘষে হাতদুটো মুছে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে নিচে নেমে গেল মেঘনা। চেঁচিয়ে ডাকল, ঠাম্মা, ও ঠাম্মা, আমি একটু একজায়গায় যাব। আমার জামা বের করে দাও।

একা একা এই দুপুরে কোথায় যাবে দিদিভাই? রাস্তায় লোক নেই, জন নেই। মেঘনার ঠাম্মা টিভি-টাকে মিউট করে সোফা থেকে উঠে এলেন।

আর একটু হলেই মেঘনা মুখ ফসকে আসল কথাটা বলে ফেলেছিল। হঠাৎ, মনে পড়ল, সেই দাদুটা তো কাউকে কিছু বলতে বারণ করেছে। দাদুটাই বলেছিল, একটা পুঁতি কিংবা চুমকি বসানো ফ্রক পরে যেতে। আর ক্যালাইডোস্কোপটা তো নিয়ে যেতেই হবে। ওটা তো ওই দাদুটারই বানানো। দাদু বলেছে ওকে আজ আরও বড়ো আর আরো সুন্দর একটা ক্যালাইডোস্কোপ দেবে।

উঁহু, ঠাম্মাকে কিছু বলা যাবে না। মেঘনা বানিয়ে বানিয়ে বলল, আমি রোহনের বাড়ি যাচ্ছি। ওর কাছে আমার ন্যাচারাল-সায়েন্স প্রোজেক্টের খাতা রয়ে গেছে। এক্ষুনি নিয়ে এসে কমপ্লিট না করলে কাল... ছোটো ছোটো মুঠি হাওয়ায় তুলে মেঘনা দেখিয়ে দিল কাল স্কুলে পিঠে কেমন দুমদাম পড়বে। তারপর বলল, ঠাম্মা, আমার ক্রিম-কালারের ফ্রকটা আলমারি থেকে বার করে দাও তো। ওই যেটায় বুকের কাছে নীল নীল চুমকি বসানো আছে।

বন্ধুর বাড়ি যাবি চুমকি বসানো ফ্রক পরে? অবাক গলায় ঠাম্মা জিজ্ঞেস করল।

—ওঃ ঠাম্মা, তুমি দাও তো তাড়াতাড়ি।

মেঘনার ঠাম্মা ফ্রকটা মেঘনার হাতে দিয়ে বললেন, তোর মা বাবা অফিস বেরোনোর আগে কতবার তোকে বলে গেল, বাড়ি থেকে একা-

একা না বেরোতে, তবু তুই শুনলি না? জানিস তো, পেছনের বস্তির লছমিকে ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গেছে? এক সপ্তাহ ধরে ওকে ওর বাড়ির লোক খুঁজে পাচ্ছে না। লছমি তো তোরই বয়সি ছিল। তোকেও যদি ছেলেধরায় ধরে?

মেঘনার মনে পড়ে গেল একটু আগে দেখা সেই দৃশ্যটার কথা। সত্যিই লছমিকে ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গেছে?

কি সুন্দর দেখতে ছিল লছমিকে। ওর বাবা রাস্তার মোড়ে কয়লার উনুন জেলে জামা প্যান্ট ইস্ত্রি করে। লছমি হাতে কাচের চুড়ি পরত। মেঘনারও খুব কাচের চুড়ি পরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মা কিনে দেয় না। বলে, ভেঙে গিয়ে হাতে ফুটে যাবে।

মেঘনা চটিতে পা গলাতে গলাতে বলল, জানো তো ঠাম্মা, একটু আগে না লছমিকে দেখলাম।

—কোথায়?

—ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে।

ঠাম্মা অবাক গলায় বললেন, কি যে পাগলের মতন বকিস!

ঠাম্মাকে সবটা বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তাই মেঘনা আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। যেতে হবে মুন্সিপাড়া। বেশি দূরে নয়। ওখানেই খালের ধারে দাদুটা থাকবে বলেছে।

পেছন থেকে ঠাম্মা বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরবে মেঘনা। রোহনের বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যাবে না।

ঠাম্মার দিকে মুখ না ফিরিয়েই মেঘনা রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে জবাব দিল, আচ্ছা, আচ্ছা। যাব না।

*****

বিবেক চোখ থেকে ক্যালাইডোস্কোপ-টা নামিয়ে অবাক হয়ে চারিদিকে চাইল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে প্রায় পনেরো মিনিট আগে। ক্লাসরুমে এখন আর কেউ নেই, শুধু সে একা। ক্লাসরুমের জানলার ওপাশে করবী গাছটা হাওয়ায় দুলছে। অনেক দূরে আবছা দেখা যাচ্ছে জৈন মন্দিরের চুড়ো। বিবেক নিশ্চিন্ত হল, তার চোখ খারাপ হয়নি।

এমন নেশা হয়ে গেছে তার এই ক্যালাইডোস্কোপটায়। কোনোরকমে এতক্ষণ না দেখে ছিল। কিন্তু আর পারল না। সব বন্ধু বেরিয়ে যেতেই স্কুল-ব্যাগ থেকে রঙিন কাগজে মোড়া সিলিন্ডারটা বার করে চোখে লাগিয়েছিল। আর তারপরেই...।

লছমি কিংবা মেঘনা কেমন করে ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে থেকে তাকিয়ে থাকে? ওরা দুজনেই তো হারিয়ে গেছে। ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গেছে ওদের। ক্যালাইডোস্কোপের ভেতর থেকে ওই লছমি আর মেঘনাই ওকে কিছু বলছিল। আরো একটা মেয়ে ছিল, তাকে চেনে না বিবেক। সে ওদের থেকেও ছোট। ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে ওরা। বিবেক দৃশ্যটা ভাবতেই ভয়ে কেঁপে উঠল।

বিবেক আবার ভয়ে ভয়ে ক্যালাইডোস্কোপটা চোখের সঙ্গে লাগাল। তারপরেই ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। ধুর, কোথায় লছমি? কোথায় মেঘনা কিংবা অচেনা মেয়েটা? ক্যালাইডোস্কোপের ভেতরে শুধু তিন আয়নায় ঘেরা আশ্চর্য এক তিনকোনা বাগান। সেই বাগানে শয়ে শয়ে ফুল ফুটেছে – লাল কমলা হলদে সাদা। ফুলের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে উজ্জ্বল নীল প্রজাপতি উড়ে এসে বসছে।

এই ক্যালাইডোস্কোপটা বানিয়েছে মুন্সিপাড়ার খালের ধারে টালির ঘরে যে দাদুটা থাকে, সে। তার কাছে যাবে বলেই বিবেক আজ স্কুল ছুটির পরেও থেকে গেল।

স্কুল-ব্যাগটা কাঁধে তুলে বিবেক রাস্তায় নামল। কাশীদা নিশ্চয় তার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে রিকশা নিয়ে চলে গেছে। বাড়ি ফিরে মা-কে যে কী বলবে কে জানে। ঠ্যাঙানি আজ কপালে নাচছে। নাচুকগে। তার থেকে অনেক বড় ব্যাপার ওই ক্যালাইডোস্কোপ। দাদু বলেছিল এইটা ফেরত নিয়ে আরো বড়ো আর আরও সুন্দর একটা ক্যালাইডোস্কোপ দেবে ওকে। এমনকি বিবেক চাইলে আজ তাকে ওরকম ক্যালাইডোস্কোপ তৈরি করা শিখিয়েও দিতে পারে।

দাদুর কিন্তু একটু মাথা খারাপ আছে। আগের দিন অদ্ভুতভাবে বিবেকের দাঁতের ব্রেসগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ওগুলো খোলা যায়?

বিবেক মাথা হেলিয়ে বলেছিল হুঁ। কিন্তু খুব টাইট। খুলতে গেলে ব্যথা লাগবে।

না, না। ব্যথা লাগবে না। ব্যথা লাগবে না। আমি খুব আলতো করে খুলে নেব।

বিবেক অবাক হয়ে বলেছিল, কেন? খুলে নেবে কেন?

দাদু তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

দাদুটার চোখদুটোর দিকে তাকালে কেমন যেন ভয়-ভয় লাগে। কিন্তু ভয় পেলে ক্যালাইডোস্কোপ বানানো শেখা হবে না।

ক্যালাইডোস্কোপটা হাতে নিয়ে বিবেক খালের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েকদিন আগে কর্পোরেশনের লোকেরা খাল থেকে কচুরিপানা তুলে, পাহাড়ের মতন উঁচু করে জমিয়ে রেখেছে। ওই পাহাড়ের মধ্যেই কোথাও নিশ্চয় কোনো বদমাশ লোক মরা কুকুর-কিংবা বেড়াল ফেলে গেছে। পচা গন্ধে বিবেকের গা গুলিয়ে উঠল। সে রুমালটা বার করবে বলে পকেটে হাত ঢোকালো আর ঠিক তখনই কেউ পেছন থেকে তার গলাটা টিপে ধরল।

*****

ক্যালকাটা-পুলিশের ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের অফিসার মানস ব্যানার্জী শোবার ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। ওঁর মেয়ে বাবলি খাটের ওপর বসে চোখের সামনে রঙিন কাগজে মোড়া দূরবিনের মতন কি একটা নিয়ে খেলা করছিল। কাল সারারাত মানসবাবু বাড়ি ছিলেন না। গাড়ি এবং ফোর্স নিয়ে, হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। চান-খাওয়া সারবার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরেছেন। আবার তাকে বেরোতে হবে।

একটা জায়গা থেকে পরপর তিনটে বাচ্চা হারিয়ে যাওয়ায় শুধু এই শহরে নয়, সারা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সবচেয়ে প্যাথেটিক ব্যাপার হল, মেঘনা আর বিবেক নামের ছেলেমেয়ে দুটো বাবলির স্কুলেই ওর চেয়ে একক্লাস নীচে পড়ত। বাবলি ওদের দুজনকেই ভালোমতন চিনত, তাই ওরও খুব মনখারাপ। আর লছমি বলে মেয়েটাকে শুধু বাবলি বা ওর মা নয়, মানসবাবুও চিনতেন। মিষ্টি

মেয়েটা ওর বাবার ইস্ত্রির দোকানে বসেই সকাল সন্ধে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করত। খুব খারাপ লাগছে মানস ব্যানার্জীর। ছেলে মেয়েগুলো উদ্ধার না হওয়া অবধি তাঁর মন শান্তি পাচ্ছে না।

অথচ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এদের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তিনি এখনো কোনো চেনা ছকে ফেলতে পারছেন না। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে নোংরা ব্যবসা করে যে গ্যাং-গুলো, তারা এরকম বড়ো শহরের পয়সাওলা লোকেদের ছেলেমেয়েদের দিকে হাত বাড়ায় না। এদের দিকে হাত বাড়ায় কিডন্যাপাররা। অথচ বিবেক বা মেঘনার ফ্যামিলির কাছে এখনো মুক্তিপণ চেয়েও কোনো ফোন-টোন আসেনি। তাহলে কোন সূত্র ধরে পুলিশ এগোবে? এইসব ভাবতে ভাবতেই মানসবাবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টুপিটা ঠিক জায়গায় প্লেস করছিলেন।

এগারো বছরের মেয়ে বাবলির কিন্তু বাবার দিকে মন ছিল না। সে তন্ময় হয়ে ক্যালাইডোস্কোপটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরের আশ্চর্য বাগানটাকে দেখছিল। হলুদ ফুল, কমলা ফুল। নীল প্রজাপতি। রুপোলি খরগোশেরা তুড়ি লাফ দিয়ে এদিক ওদিক নেচে বেড়াচ্ছিল।

আয়নার মধ্যে দিয়েই মানসবাবু দেখলেন, বাবলি হঠাৎ চোখ থেকে ওই খেলনাটা নামিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতন বসে রইল। তারপর আর একবার ওটা চোখে লাগিয়েই তীব্র তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে উঠল বাবলি। ওর হাত থেকে রংচঙে নলটা মেঝেয় পড়ে একদিকে গড়িয়ে গেল।

কী হল বাবলি? কী হল? —মানসবাবু আয়নার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে মেয়ের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বাবলির শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপছে।

বাবা... বাবা... ওরা। ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে ওরা সবাই রয়েছে। বাবলি ভয়ে আতঙ্কে ফোঁপাতে শুরু করেছিল।

কী বলছিস বাবলি? ক্যালাইডোস্কোপের ভেতরে আবার কেউ থাকে না কি? কাদের দেখলি বোকা মেয়ে?

না বাবা। আমি দুবার দেখলাম – লছমি, মেঘনা, বিবেক, ওরা সবাই ওর মধ্যে রয়েছে। ওরা খুব ভয় পেয়ে গেছে, ওরা কাঁদছে, ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবলি আর কথা বলতে পারছিল না।

ইতিমধ্যে বাবলিকে দেখাশোনা করার লোক মিনতিদি বাবলির চিৎকার শুনে দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকেছে। সে যখন বাবলির মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল ততক্ষনে মানসবাবু মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে খুলে ফেলেছেন ক্যালাইডোস্কোপের আই-পিস। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে নানান রঙিন জিনিসের টুকরো —ওই যেগুলো আয়নার পর আয়নায় রিফ্লেক্টেড হয়ে বানিয়ে তোলে কমলা, হলুদ, লাল, সাদা ফুল। বানিয়ে তোলে নীল প্রজাপতি আর রুপোলি খরগোশ।

মেঝের ওপর থেকে মানসবাবু কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন ভাঙা চুড়ির টুকরো, শিশুদের পোশাকে বসানো নীল চুমকি, দাঁতের রুপোলি মেটাল-ব্রেস। মানসবাবুর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল হারিয়ে যাওয়া তিনটে বাচ্চার ডেসক্রিপসনের কিছু কিছু অংশ।

লছমি পান্ডে —হাতে ছিল কাচের চুড়ি। মেঘনা রায় —পরনে ছিল নীল চুমকি গাঁথা ক্রিম-কালারের ফ্রক। বিবেক জয়সওয়াল —দাঁতে মেটাল-ব্রেস পরানো ছিল।

মানসবাবু ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার মতন মেঝে থেকে ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মেয়েকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, লক্ষ্মী মা আমার। তুই শুধু দেখিয়ে দে ওই ক্যালাইডোস্কোপটা তুই কোত্থেকে পেয়েছিলিস। কে তোকে ওটা দিয়েছিল।

বাবলি ফোপাতে ফোঁপাতেই বলল, বাবা, দাদুটা না আমাকে একলা যেতে বলেছিল। বলেছিল, আমার কানের দুলগুলো খুব সুন্দর। আর... আর আমাকে একটা বড়ো ডল-পুতুল দেবে বলেছিল।

*****

পুলিশ-ভ্যানের মধ্যে বসেছিল বুড়ো লোকটা। লোকটাকে দেখলে কেউ বলবে না যে, সে একটা বেড়ালের দিকেও ঢিল ছুঁড়তে পারে। অথচ ওই লোকটাই ঠান্ডা মাথায় তিনটে বাচ্চাকে খুন করেছে।

ভ্যান ঘিরে দৌড়চ্ছিল রাগে ফেটে পড়া মানুষজন। তাদের দাবি, খুনেটাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ওরা ওই খুনে বুড়োটাকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলবে।

দৌড়চ্ছিল মিডিয়ার লোকজন। তারা মানসবাবুর মুখ থেকে সাইকোপ্যাথ-কিলারটার সম্বন্ধে দু-একটা কথা শুনতে চায়। এইভাবেই ভ্যানটা থানায় পৌঁছে গেল।

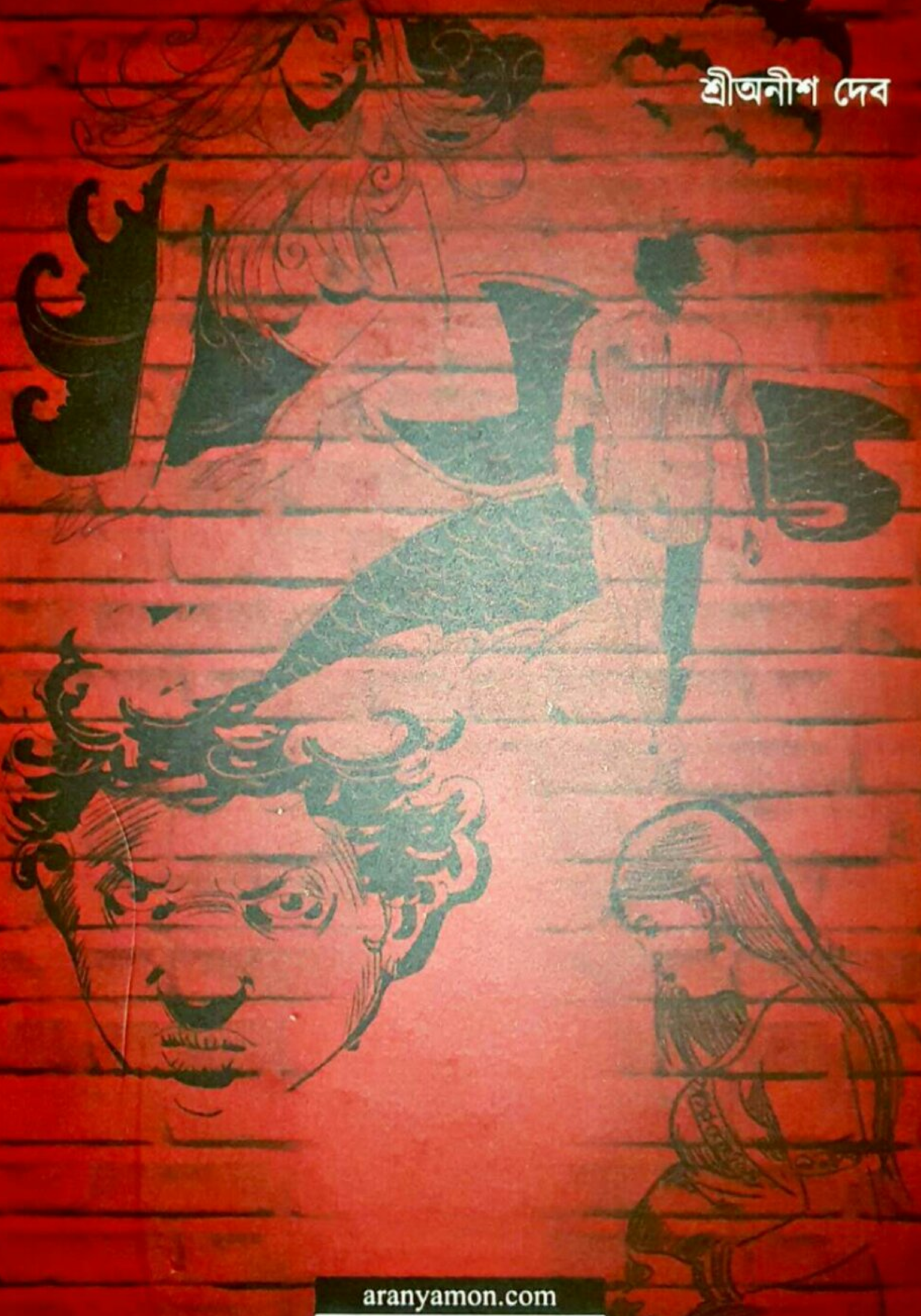
থানার ভেতরে লোকটা কিন্তু শান্ত হয়েই বসেছিল। হাতের হাতকড়া, কোমরের দড়ি, চারিদিকের চিৎকার কিছুই তাকে স্পর্শ করছিল না। সে শুধু একদৃষ্টিতে টেবিলের ওপর রাখা ক্যালাইডোস্কপটার দিকে তাকিয়েছিল। ওর মধ্যেই না কি রয়ে গেছে তার নাতনি, যার নাম কুসুমকুমারী।

আমার নাতনিটাকে যাতে একা-একা কষ্ট পেতে না হয় সেইজন্যেই তো মেঘনা বিবেক আর লছমিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওই ক্যালাইডোস্কোপের মধ্যে —লোকটা একবার বলেছিল মানসবাবুকে। ওখানে আশ্চর্য সুন্দর এক বাগান রয়েছে, বুঝলেন স্যার। সেই বাগানে রেপ নেই, সুইসাইড নেই, খুন নেই। সে এক ছায়ার দেশ। তিন আয়নার ছায়ায় গড়া মায়াকানন। কমলা, হলুদ, লাল, সাদা ফুল। নীল প্রজাপতি আর রুপোলি খরগোশ। আপনি যদি ওটাকে এইভাবে ভেঙে না ফেলতেন, তাহলে আরো অনেক কিছু জুড়ে দিতাম ওই বাগানের সঙ্গে। আরো অনেক ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে দিতাম ওখানে। সুখে থাকত ওরা।

থানার টেবিলে রাখা ক্যালাইডোস্কোপের ফাঁকা খোলটা ঠিক তখনই নিজে থেকেই কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে স্থির হয়ে গেল। কেউ খেয়াল করে দেখল না সেই দৃশ্য।

"নোনা বালি চোরা টান বইয়ের প্রতিটি গল্প পড়ার পর গল্পের চরিত্র আর ঘটনা তীব্রভাবে ঢুকে যায় মর্মস্থলে। এবং সেখানেই তারা বসবাস করতে থাকে।"

শ্রীঅনীশ দেব



aranyamon.com

9 788194 586289

Rs : 200.00